ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ভাষার সংগ্রাম : ১৯১৭-১৯৯৯

জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি : কপোতাক্ষ তীরের মধুপল্লী

অমর একুশের বইমেলা এবং প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

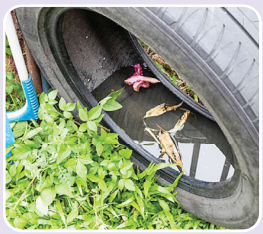

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

অমর একুশের পথ ধরেই বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এদিনে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। পুলিশ ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিকসহ অনেকে শহিদ হন। আন্দোলনের পথপরিক্রমায় বাংলা ভাষা পায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়। এ নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা। যে কটি উৎসব ও আয়োজনে বাঙালি একত্রিত হয় তার মধ্যে অন্যতম বইমেলা। অমর একুশে বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বইমেলার পটভূমি নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি কবি, প্রথম সার্থক নাট্যকার এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্বরণে রয়েছে নিবন্ধ।

সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য। ঝড়-ঝঞ্ঝায় এদেশকে রক্ষা করছে সুন্দরবন। ১৯৯৭ সালে এটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সংখ্যা। আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক কাজী শাম্মীনাজ আলম

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ভাষার সংগ্রাম : ১৯১৭-১৯৯৯ ৪
ড. মোহাম্মদ হাননান

জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি : কপোতাক্ষ তীরের মধুপল্লী ১০
ড. মোহাম্মদ আলী খান

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বই পড়ার বিকল্প নেই ১৫
মুহা. শিপলু জামান

অমর একুশে বইমেলা এবং প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ১৯
প্রণব মজুমদার

ভাষা নিয়ে কথা ২২
মুস্তাফা মাসুদ

ঋতুরাজ: আজি এ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ২৪
ফাহমিদা শারমীন হক

বাংলা, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু ২৬
শহিদুল ইসলাম

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় ভাষা শহিদদের অবদান ২৯
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

১৯৫২, একুশ এবং আজকের শহিদমিনার ৩৩
রহিম আব্দুর রহিম

ভাষা আন্দোলনের নাট্য দলিল ও মুনীর চৌধুরী ৩৫
রহিমা আক্তার মৌ

অবিনাশী অগ্নিবীণা : নজরুলের বিপ্লবী চেতনা ৩৭
পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

প্রাকৃতিক অনন্য সম্পদ সুন্দরবন ৪২
উষা রানী রায়

শিশু ক্যানসার রোধে চাই সচেতনতা ৪৪
শামসুন নাহার

উন্নত জাতি গঠনে গ্রন্থাগার ৪৫
জেসিকা হোসেন

গল্প

মেদস্খলন ৪৬
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ ৪৯-৫১

আবুল হোসেন আজাদ, রুহুল গনি জ্যোতি, অজিতা মিত্র, বেগম শামসুন নাহার, আলমগীর কবির, সপ্তিকা চক্রবর্তী, রিয়াজ মাহমুদ রাতুল, হাসান হাফিজ, সোহানা আকতার, মুহাম্মদ ইসমাঈল, আপন চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫২
প্রধানমন্ত্রী ৫৩
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৪
উন্নয়ন ৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৬
শিক্ষা ৫৭
নারী ৫৮
অর্থনীতি ৫৮
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৯
কৃষি ৬০
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬১
সামাজিক নিরাপত্তা ৬২
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি :

না ফেরার দেশে জনপ্রিয় অভিনেতা আহমেদ রুবেল ৬৪

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

ভাষার সংগ্রাম : ১৯১৭-১৯৯৯

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিরন্তর এ সংগ্রাম খুব যে আলোচিত ও মূল্যায়নকৃত হয়েছে এমনটি নয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উর্দুভাষী ড. জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর যে বাদানুবাদ হয়েছিল, তাই প্রধানভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য ড. শহীদুল্লাহর সংগ্রামটি ছিল নিরন্তর। ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে ভাষা প্রশ্নে যে তিন দফা তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হলো, তারও নৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি ছিল ড. শহীদুল্লাহর লেখনী, বক্তৃতা ও বিবৃতি। ভাষা সংগ্রাম বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'ভাষার সংগ্রাম : ১৯১৭-১৯৯৯' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি: কপোতাক্ষ তীরের মধুপল্লী

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম (২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪–২৯শে জুন ১৮৭৩) যশোরের সাগরদাঁড়ী গ্রামের কপোতাক্ষ নদের তীরে। তিনি রাজনারায়ণ বসু ও জাহ্নবী দেবীর সন্তান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক, প্রহসন ও ট্র্যাজেডি লেখেন। তিনি একজন মহাকবি, নাট্যকার, বাংলা ভাষার সনেট প্রবর্তক এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধাব্যক্তিত্ব। তাঁকে 'মধুকবি' বলেও ডাকা হয়। মধুকবির দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা 'জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি : কপোতাক্ষ তীরের মধুপল্লী' শীর্ষক নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা–১০

অমর একুশে বইমেলা এবং প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা

বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা। অমর একুশে বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে যথারীতি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ও সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার বইবিক্রির মধ্য দিয়ে এর ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। সেই হলো শুরু। এ নিয়ে 'অমর একুশে বইমেলা এবং প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১৯

ভাষার সংগ্রাম : ১৯১৭-১৯৯৯

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলা ভাষার সংগ্রামটা প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। এ ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ কেন বাংলার সীমান্তের বাইরে নেপালে পাওয়া গিয়েছিল, তার উত্তরের মধ্যেই বাংলা ভাষার সংগ্রামের প্রাচীনত্বের সাক্ষী রয়ে গেছে। বাংলা ভাষা চর্চা সেই প্রাচীনকালে নিরাপদ ছিল না। কেউ যাতে বাংলা চর্চা না করে তার নির্দেশনা সেদিন দেওয়া হয়েছিল। ভয় দেখানো হয়েছিল আখেরাতের। ফতোয়া জারি করে বলা হয়েছিল:

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥[১]

এর সহজ-সরল অর্থ হলো, মানুষের ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়া বা শোনা যাবে না। যদি কেউ এটা করে, তাহলে সে রৌরব নামক নরকে যাবে। দীনেশচন্দ্র সেন এর পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

> সদুক্তিকর্ণামৃত ও লোক-প্রবাদে লক্ষ্মণসেনের অনেক সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়, রাজা পণ্ডিতমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া নব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন, কোন তিথিতে ব্রাহ্মণকে কি দান করিলে কি ফল হয় এই সকল বিচার চলিত, তিনি ছিলেন পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা-পণ্ডিত; পণ্ডিতগণ ছিলেন তাঁহার স্বগণ। জনসাধারণের সঙ্গে পালরাজগণের যে যোগ ছিল সেনদের সঙ্গে তাহাদের আর সে যোগ রহে নাই। জনসাধারণ পালদের সময় নূতন নূতন গ্রাম্যগীত রচনা করিত; রূপকথা, গীতিকথা প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহা শুনিতেন। ... কিন্তু সেনদের সময় কি সাধ্য যে জনসাধারণ বাঙ্গলা গান লইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে? ... পরে যখন বাঙ্গলা ভাষার রামায়ণ ও মহাভারতাদির ব্যাখ্যা আরব্ধ হইল, তখন ভট্টাচার্য্যের দল রাগিয়া গিয়া অভিশাপ দিলেন, ধর্ম্মগ্রন্থ যে বাঙ্গলায় শুনিবে সে ঘোর নরকে যাইবে।[২]

তবে ভাষার সংগ্রামটি এতকাল লেখালেখি, বলাবলি প্রসঙ্গেই মুখ্য ছিল। ১৯১৭ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে মতামত জানতে চান, ভারত স্বাধীন হলে এদেশের জাতীয় ভাষা কী হতে পারে। উত্তর দেওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এক সভা ডাকেন। এতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এতে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ভারতের জাতীয় ভাষা হতে পারে বাংলা, উর্দু এবং হিন্দি। তবে বাংলারই দাবি অগ্রগণ্য।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে এ বিষয়ে ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে এক চিঠিতে তাঁর মতামত পেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতের 'জাতীয় ভাষা' শব্দটি এড়িয়ে গেলেন। তিনি লিখলেন, ভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববিনিময়ের জন্য সম্ভাব্য ভাষা হতে পারে হিন্দি।[৩]

রবীন্দ্রনাথ-গবেষক সমীর সেনগুপ্ত বলেছেন, 'তবে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেয়াটা রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি'।[৪]

রবীন্দ্রনাথ কেন হিন্দি ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তা নিয়ে সে সময় কেউ কোনো কথা বলেননি, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোনো বিবৃতিও আসেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি।[৫]

তারপরও রবীন্দ্রনাথ কেন 'হিন্দি'র পক্ষে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন সেটা অবশ্যই গবেষণার দাবি রাখে। এমন হতে পারে যে, গান্ধীকে খুশি করতেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দির কথা বলে থাকবেন। এমনও হতে পারে তখন সবকিছু ছিল দিল্লি কেন্দ্রিক, তাই দিল্লিতে প্রচলিত হিন্দিই জাতীয় ভাষা হওয়ার যুক্তি বেশি বলে তিনি মনে করেছিলেন। নিজের মাতৃভাষা বাংলায় দিল্লির সচিবালয় চলবে, এমনটা হয়ত তিনি কল্পনাও করেননি।

এসব ঘটনাবলি যখন ঘটছিল তখন ভাষা বিষয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯১৭ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন,

> আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালোবাসার চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কী কিংবা কী হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর সমকালে ভাষা নিয়ে লেখক-কবিদের নিয়ে দলাদলি চলছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরেন। এখানে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড় দিচ্ছেন না তিনি, তাঁর বক্তৃতায় ভাষা প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও অভিযুক্ত হলেন।

> বর্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। 'একদল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের

চাঁই সবুজপত্র-এর সম্পাদক প্রমথ বাবু।' আমি রবি বাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে করি। ইহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্তন সহ্য করিতে পারেন না। সাহিত্য পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইহারা প্রাচীনপন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ-সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয়কুমার সরকার ও মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব?

এসময় ভাষা নিয়ে বাংলার পণ্ডিত সমাজে যে বিতর্ক, মহাবিতর্ক এবং কাচি চালাচালি হচ্ছিল তাঁর ভাষণে সেসব প্রসঙ্গও উঠে আসে। সাধারণের ভাষার বিরুদ্ধে সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই সতর্ক করেন,

এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাঁহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা-ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই এক দিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধুভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে।

বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে সংস্কৃত পণ্ডিতরা ভাষা পরিস্থিতিকে যেভাবে অস্থির করে তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন, ড. শহীদুল্লাহর হাতেও আমরা সেই অস্ত্র দেখতে পাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের সুরেই বলেন,

এক দল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবি পারসি শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে-তাঁহারা বাংলা দেশ হইতে যবনকে দূর করুক, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র, দিনার প্রভৃতি গ্রিক শব্দ এবং ইকবাল, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবি শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? ঐ সকল আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ানো সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি আইন-আদালতে প্রচলিত সর্ব সাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না।[৬]

রবীন্দ্রনাথও তাঁর লেখালেখির এবং বক্তৃতায় বাংলা ভাষার ওপর নির্বিচার সংস্কৃতায়নের বিরোধিতা করেছিলেন। এর পরিণামও একই হবে বলে আশঙ্কা করে ড. শহীদুল্লাহর মতোই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই– বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই।[৭]

ভাষা বিষয়ে সমকালে বাংলার উপর যে জুলুম চলেছিল, তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ও ড. শহীদুল্লাহর অবস্থান প্রায় একই রকম। কিন্তু সেদিন ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের উইলিয়াম কেরি ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের যৌথভাবে পরিচালিত এসব কর্মকাণ্ড থামানো যায়নি। এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রাষ্ট্র পুরোপুরি জড়িত ছিল।

ভাষা নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিতর্ক যখন তুঙ্গে আর যখন কেউ কারও দাবি ছাড়তে নারাজ ছিল, তখন ড. শহীদুল্লাহ সাহসের সঙ্গে ভারতের ভাষাগুলোর সবলতা ও দুর্বলতাগুলো প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন। প্রকাশিত প্রবন্ধের নামের শিরোনাম করলেন 'ভারতের সাধারণ ভাষা'। জানালেন তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭৯টি ভাষা আছে। তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির ভাষা ইংরেজিকেও তিনি আমলে নিলেন। কিন্তু বলেছিলেন,

যে দেশে শতকরা ৯০ জন মাতৃভাষাই জানে না, সেখানে একটা বাহিরের সাধারণ ভাষা শেখানো কতদূর কঠিন ব্যাপার, যাহার কিছু কল্পনা শক্তি আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন।[৮]

প্রতিটি ভাষার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে নানারকম যুক্তিকে তিনি অনুশীলন করে দেখলেন:

সংস্কৃতের পিছনে হিন্দুর, আরবির পিছনে মুসলমানের, পাঞ্জাবির পিছনে শিখের ধর্মশক্তি রহিয়াছে। এই তিনের কোনটি সাধারণ ভাষা হইতে পারিবে না, কেননা অন্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের জিদ ছাড়িবে বলিয়া মনে করা যায় না।[৯]

ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার ক্ষেত্রে উর্দু ও হিন্দির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিও তিনি পরখ করলেন। তিনি লিখলেন,

উর্দুর সপক্ষে কথা এই যে, ভারতের মুসলমানগণ উর্দুকে অগ্রেই গ্রহণ করিয়াছেন। ... উর্দুর বিপক্ষে কথা এই যে, উর্দুর লেখা অতি বিশ্রী। কাকের ঠ্যাঙ বকের ঠ্যাঙ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক সময় লেখক আসিয়া নিজে না পড়িয়া দিলে কার বাপের সাধ্য যে লেখা পড়ে। ... হিন্দির সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দির বর্ণমালা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক, বানান প্রায় ধ্বনি সংগত, যদিও ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় তিন শ-কার, দুই ন-কারের বিভীষিকা আছে।

হিন্দির বিপক্ষের কথা এই যে হিন্দি দ্রুত লিখনের মোটেই অনুকূল নহে। তারপর পণ্ডিতগণ হিন্দিতে এত অধিক পরিমাণ সংস্কৃতের সোনার দা'ল (সোনা মুগের দা'ল নয়) মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মুসলমানের ত কথাই নাই, সাধারণ হিন্দু পর্যন্ত পণ্ডিতের হজমি গুলি ব্যতীত সে খিচুড়ি হজম করিতে পারে না।...

> বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যে উর্দু ও হিন্দির ঝগড়া মিটান সোজা। কিন্তু দুই দলের যেমন জিদ, তাহাতে কাজের বেলায় সোজা জিনিসটাও নিতান্ত বাঁকা বলিয়া বোধ হইবে।[১০]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কিন্তু বাংলার মহত্ত্বের কথা বলতে ভুলে যান না। তিনি বললেন,

> সাহিত্যের শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে একটি মাত্র ভাষা সাধারণ ভাষার দাবি করিতে পারে তাহা বাঙ্গালা ভাষা। আমি একথা বলি না যে ভারতীয় কোনও ভাষায় সাহিত্য সম্পদ নাই।... কিন্তু যে শক্তিতে এক ভাষা দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে সে শক্তি ভারতীয় আর কোনও ভাষায় নাই। ...
>
> সহজত্বের দিকে দেখিলে, ভারতে এমন সহজ ভাষা আর নাই। লিঙ্গ বচনের গোলযোগ ইহাতে নাই। বাঙ্গালার অক্ষর অতি পরিপাটি। পড়িবার কোন গোলযোগ হয় না, অথচ দ্রুত লিখনের উপযোগী।
>
> বাঙ্গালার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে ইহার বানান সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নহে। বাংগালার হ্রস্ব ও,হ্রস্ব এ, অ্যা, (একের এ), তেরচা আ (চা' লের আ), তেরচা হ্রস্ব ও (খোলের খ এর পরস্থিত স্বর) এই স্বরগুলি আছে অথচ তাহা লিখিয়া দেখানো হয় না। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ঞ, ণ, য, ষ এই অক্ষরগুলি অতিরিক্ত, অথচ লেখা হয়। বানানে সংস্কৃত প্রণালী অনুসরণ করা হয়, অথচ উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে একেবারে আলাদা। লেখা হয় ভিক্ষা= ভিক্‌ষা, পড়া হয় ভিক্‌খা, লেখা হয় অশ্ব= অশ্‌ ও অ, পড়া হয় অশ্‌শ, লেখা হয় লক্ষ্মী= লক্‌ষমী, পড়া হয় লখ্‌খী, লেখা হয় পদ্ম= পদ্‌ম, পড়া হয় পদ্দঁ। তারপর সংযুক্ত অক্ষরের বাঁধা বড় কম নয়। আমাদের অভ্যস্ত চোখে সেটি না টিকিলেও নূতন চোখে সেটি বেশ বিভীষিকার সঞ্চার করে। এইরূপ অত্যাচার ঢের আছে।[১১]

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিরন্তর এ সংগ্রাম খুব যে আলোচিত ও মূল্যায়নকৃত হয়েছে এমনটি নয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উর্দুভাষী ড. জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর যে বাদানুবাদ হয়েছিল, তাই প্রধানভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য ড. শহীদুল্লাহর সংগ্রামটি ছিল নিরন্তর। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তা থামেনি। বরং ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে ভাষা প্রশ্নে যে তিন দফা তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হলো, তারও নৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি ছিল ড. শহীদুল্লাহর লেখনী, বক্তৃতা ও বিবৃতি।

বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানস চেতনায় নতুন মহিমা দান করেছিল। সময় বোঝানোর জন্য বলা হতো 'ভাষা আন্দোলনের আগে', 'ভাষা আন্দোলনের পরে', অফিস-আদালতে বাংলায় কথাবার্তা বলা ও লেখায় নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি পোশাকেও পরিবর্তন এসেছিল। স্যুট-কোট ছেড়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১২]

একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে বাঙালি জাতির যে একটা ভাবাবেগ তা পরবর্তী বছর ১৯৫৩ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। একুশের ভোরে নগ্নপায়ে প্রভাতফেরি চালু হয়, শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর রীতি এ বছরই শুরু হয়েছিল। এমনকি এ বছরই প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ থেকে ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে রোজা রাখারও আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক বড়ো সাফল্য আসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে। সরকার ও মুসলিম লীগ-বিরোধী সকল দলের মহাজোট যা যুক্তফ্রন্ট নামে প্রচার লাভ করেছিল, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে তাদের জয়লাভ সমগ্র পাকিস্তানের মৌলিক ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল, সে দলটিরও কবর রচিত হলো, এদেশে সেদিন থেকেই মুসলিম লীগের রাজনীতি শেষ হয়ে যায়।

ভাষা আন্দোলনের আরেকটি প্রাপ্তি ঘটে ১৯৫৭ সালের ১০ই আগস্ট সরকারি প্রজ্ঞাপনে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানটি পরে বাঙালি জাতির মনীষার প্রতীক হয়ে উঠে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের পরও ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বাঙালির সমাজ মানসে নিয়তিই প্রভাবিত হচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলেও একুশের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা আবার সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গোয়েন্দা রিপোর্টেও তা প্রতিফলিত হয়।[১৩] বাষট্টির সামরিক শাসন ও শিক্ষানীতি বিরোধী সকল আন্দোলন এবং ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয় দফা ঘোষণার পর বাঙালি জাতির মধ্যে স্বাধীনতার যে স্পৃহা জেগে উঠে, তাও ভাষা আন্দোলনেরই প্রভাবজাত।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রোপিত বীজ চারাগাছ হয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংগটিত হয় এবং একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলা মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান রচিত হয় বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য দেশের রাজ্য ও প্রদেশগুলোতেও এর প্রভাব পড়ে, যার ফলে সেসব অঞ্চলে মাতৃভাষার মর্যাদা সংরক্ষণে নানারকম আয়োজন চলতে থাকে। ১৯৫২ সালে ভারতের বাংলাভাষী ত্রিপুরা রাজ্য ঘোষণা করে তারা 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কে বাংলা ভাষা দিবস হিসেবে সরকারিভাবে পালন করবে। বাংলাভাষী পশ্চিম বাংলা প্রদেশেও প্রথম থেকেই বেসরকারিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছিল।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব কতখানি সর্বগ্রাসী ছিল তার বড়ো প্রমাণ আসে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে বাঙালি জাতির প্রাণের আবেগ ও প্রণোদনাই এই দিবসকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সরাসরি একুশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় বাংলাদেশের গফরগাঁও থেকে। ১৯৯৭ সালের

একুশের এক অনুষ্ঠানে 'গফরগাঁও থিয়েটার' নামক সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছিল। ১৯৯৯ সালের একুশের সংকলনে গফরগাঁও থিয়েটার তাদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে। 'অর্ঘ্য' নামের এই সংকলনে এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও প্রচ্ছদে 'বিশ্বমাতৃভাষা দিবস চাই ॥ একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই' শীর্ষক স্লোগানও তারা মুদ্রিত করে।[১৪]

একই বছর গফরগাঁও-এর নাট্যকর্মীরা একুশের বিশ্বমর্যাদা দাবি করে শোভাযাত্রা বের করে, শহরের দেয়ালে পোস্টার এবং বাসে ও ট্রেনে স্টিকার লাগায়। উল্লেখ্য, ভাষা-শহিদ জব্বার গফরগাঁও-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩০শে নভেম্বর (১৯৯৯) তারিখে ঢাকার ইংরেজি দৈনিক *বাংলাদেশ অবজারভার* চুয়াডাঙ্গা থেকে পাঠানো পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এম. ইনামুল হকের একটি চিঠি প্রকাশ করে। চিঠিতে ইনামুল হক দাবি করেন, ১৯৯৮ সালের ২৫শে মার্চ তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দানের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।[১৫]

২২শে নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ইনামুল হক শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক পত্রে এ সম্পর্কে একটি দলিলও প্রেরণ করেন।

জনৈক ব্যক্তি 'সুনাগরিক' নামে দৈনিক *বাংলার জনমত* পত্রিকার ১৯৯৪ সালের ৬ই এপ্রিল সংখ্যায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার উদ্যোগ নিতে চিঠিপত্র বিভাগে একটি পত্র ছাপিয়েছিলেন।[১৬]

তবে এক্ষেত্রে প্রধানভাবে ফল বয়ে এনেছিল কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠীর উদ্যোগ। এই গোষ্ঠী প্রথমে ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করে।

মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠীর এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন সাত জাতি ও সাত ভাষার দশজন সদস্য। এঁরা হলেন : অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মোরিন ও সুসান হজিন্স (ইংরেজি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (কা-চি), রেনাটে মার্টিনস (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি) এবং রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলা)। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, বিষয়টির জন্যে নিউইয়র্কে নয়, যোগাযোগ করতে হবে প্যারিসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংগঠন ইউনেস্কোর সঙ্গে। জাতিসংঘে কর্মরত একজন বাঙালি কর্মকর্তা হাসান ফেরদৌসেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান ছিল।

এর মধ্যে প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়। রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম প্রমুখ মোটেই হতাশ হননি। রফিকুল ইসলাম প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে এ বিষয়ে সম্ভবত প্রথমে টেলিফোন করেছিলেন।

১৯৯৯ সালের ৩রা মার্চে লেখা ইউনেস্কো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের আন্না মারিয়া মেজলোক একটি চিঠিতে রফিকুল ইসলামকে তাঁর টেলিফোনের বরাত দিয়ে লিখেছেন,

বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য-রাষ্ট্রের মাধ্যমে উত্থাপিত হতে হবে। ইউনেস্কো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের এই কর্মকর্তা মারিয়া সম্ভবত এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অবদানও এ ইতিহাসের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত থাকবে।

রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অতিদ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অফিসে নোট পাঠায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাগিদ দিয়ে লেখে :

> International Mother Language Day সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে ইউনেস্কোর কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছুতে হবে। ... এমতাবস্থায় ... প্রস্তাবটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনার জন্য সারসংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে পেশ করা যেতে পারে।

অর্থাৎ মাঝে সময় ছিল মাত্র দুদিন। ইতিহাস-পাঠক এই পর্বে শুধু ধন্যবাদ নয়, আজীবন জাতির পক্ষে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখতে পারেন ১৯৯৬-২০০১ সালের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেককে। কঠিন-কঠোর আমলাতান্ত্রিক বিধিমালা এড়িয়ে (বলা চলে বাদ দিয়ে) এ দু'জন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নথি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিকতার প্রক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মর্যাদালাভের শেষ আশা জাগিয়ে তোলেন প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এবং এর নেতা শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এ ক্ষেত্রে খুব কাজে দিয়েছিল। তিনি অধিবেশনে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ১৮৮টি জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে অভিমত গড়ে তুলেছিলেন। তিনিই উপস্থিত সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন, দিবসটি পালন করতে প্রকৃতপক্ষে ইউনেস্কোর এক ডলারও লাগবে না, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ নিজেরাই নিজেদের মাতৃভাষার জয়গান গাইতে দিবসটি পালন করবে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক একইসঙ্গে কতকগুলো ব্যক্তিগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চালান। এক রাতে তিনি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের নেতার সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। প্রস্তাবটিতে পাকিস্তানের সমর্থন নিশ্চিত করা খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন ঘিরে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংগঠিত হয়েছিল, তাতে পাকিস্তানের মনোভাবে অবশ্যই স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল। এছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশ, বিশেষ করে সৌদি আরবের সমর্থনের ক্ষেত্রেও সে দেশের ইতিবাচক ভূমিকা প্রভাব ফেলতে পারত। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ফলে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী সে বছর ইউনেস্কো সম্মেলনে যাননি, পাকিস্তানি দলের নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব। বৈঠকে এ এস এইচ কে সাদেক আবিষ্কার করেন, পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব এক সময় তাঁর অধীনে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কাজ করেছেন। আরও দেখা গেল, পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব বাংলায়

চমৎকার কথা বলতে পারেন। এ বৈঠক এভাবে খুবই ফলপ্রদ হলো। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থনের আশ্বাস দেন। পরদিন সকালে সৌদি শিক্ষামন্ত্রীর সম্মানে চা-চক্রের আয়োজন করা হলো। সৌদি শিক্ষামন্ত্রী বললেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি পরে তাঁর মতামত জানাবেন। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী বুঝে গেলেন, ১৯৫২ সালের ব্যাপার বলে সৌদি মন্ত্রী পাকিস্তানের মতামতটা জেনে সিদ্ধান্ত দিতে চাচ্ছেন। পরে সৌদি আরব এত বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছিল যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় বাংলাদেশের সঙ্গে তারা যৌথ প্রস্তাবকও হয়ে যায়।

ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় তাদের আপত্তি ছিল না, তবে তারা ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে শিক্ষামন্ত্রী যুক্তি ও আবেগের সঙ্গে এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকারের জন্যে রক্ত দিয়েছে এবং সেটা ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে। পয়লা মে দিনটি যেমন শিকাগোর ঘটনা দ্বারা অভিষিক্ত, তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাও সমভাবে তাৎপর্যময়। তখন ইউরোপীয়রা ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ পাপুয়া নিউগিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাব পেয়ে উপলব্ধি করে, তাদের দেশের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিসত্তার শত শত এবং আলাদা আলাদা মাতৃভাষা রয়েছে, যার অনেকগুলোই বিলুপ্ত হতে চলেছে। তারাও একুশে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবে উৎসাহী হয়ে সমর্থক-সদস্য হতে চায়।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার এই 'প্রাথমিক পদক্ষেপ' সম্পন্ন করে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৯ দেশে ফেরেন। বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে তিনি আনন্দের সঙ্গে খবরটি পরিবেশন করেন। বাসস ৪ঠা নভেম্বর সংবাদটি পরিবেশন করে। ৫ই নভেম্বর দেশের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে একমাত্র *ভোরের কাগজ* প্রথম পৃষ্ঠায় একেবারে উপরের দিকে আধ কলামের বক্স নিউজে শিরোনাম করে লেখে, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হতে যাচ্ছে'। বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ভোরের কাগজ আরও লেখে,

> ...বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটির ওপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। ভোট দেবেন এ সম্মেলনে যোগদানকারী ইউনেস্কোর ১৮৮টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা।... শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল *বাসস*কে বলেন, ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশের এই প্রস্তাবে ইউনেস্কোর সব সদস্য-রাষ্ট্রই সমর্থন দেবে বলে তিনি আশাবাদী। [*ভোরের কাগজ*, ৫ই নভেম্বর ১৯৯৯]।

এভাবে শেষ পর্যন্ত ১৭ই নভেম্বর (১৯৯৯) একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর মর্যাদালাভে সক্ষম হয়। মূল অধিবেশনে প্রস্তাবক হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের নামও যুক্ত হয়। প্রস্তাবের সমর্থক হিসেবে উচ্চারিত হয় আইভরিকোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ওমান, কমোরোস, গাম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপিন, বাহামাস, বেনিন, বেলারুশ, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেসিয়া, মিশর, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া এবং হন্ডুরাসের নাম।

প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সাধারণ সম্মেলনে ১৬ই নভেম্বরই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' শীর্ষক প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত পাস হয় ১৭ই নভেম্বর।[১৭]

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার সিদ্ধান্তে সারা দেশে আনন্দের ঢল বয়ে গিয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থির করে, এমন একটি আনন্দ ও গৌরবকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করা হবে। তারিখ ঠিক করা হয় ৭ই ডিসেম্বর (১৯৯৯)। এ উপলক্ষে পল্টন ময়দান থেকে শহিদমিনার পর্যন্ত এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করে অনুষ্ঠানটি। পল্টনের সমাবেশে বক্তৃতার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহিদমিনার অভিমুখী লাখো জনতার উল্লাসমুখর শোভাযাত্রায় সরাসরি অংশ নেন।

৭ই ডিসেম্বর (১৯৯৯) পল্টনের এই উৎসব-সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন। প্রকৃতপক্ষে, এ নিয়ে একটি কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. রাজীব হুমায়ুন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সঙ্গে দেখা করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে একটি চিঠি দেন। এতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার পরিচয় ও প্রবাহ ধরে রাখার জন্যে একটি আর্কাইভস প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায় তিনি প্রস্তাবটি একটি প্রকল্প আকারে সরকারের কাছে পেশ করার জন্যে বলেন। ড. রাজীব হুমায়ুন প্রকল্পের খসড়া তৈরি করে জমা দিতে দিতেই ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণাটি চলে আসে। খুব প্রয়োজনীয় সময়েই এমন একটি প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাকে ঐতিহাসিক বলা চলে।

মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে দেশের জনপ্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের একটি সভা ২০০১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাব করা হয় যে, দ্রুতই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়া উচিত এবং এই তাৎপর্যময় অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালককে আমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫ই মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। বাঙালি জাতি তাঁর আপন ভাষার অধিকার ও মর্যাদার জন্যে ১৯৫২ সালে ঢাকায় যে রক্ত দিয়েছিল, প্রায় ৫০ বছর পরে ২০০১ সালে সেই ঢাকাতেই সমগ্র বিশ্বের সকল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে

এমনিভাবে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার, অনুষ্ঠানে বিশ্বের সকল জাতির পক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্যেই একদিন ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। উর্দু ভাষাকে বাঙালির মাতৃভাষার ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস সফল হলে বাংলা ভাষার অবস্থা আজ কী হতো, তা সহজে অনুমেয়।

১৯৫২ সালে বাঙালিদের দাবি ছিল: বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। 'অন্যতম' শব্দ জুড়ে দেওয়ায় সেদিন এর অর্থ দাঁড়িয়েছিল, বাংলা ছাড়াও তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যান্য মাতৃভাষার প্রতিও বাঙালিরা শ্রদ্ধাশীল।

আজ এই দেশে পাকিস্তানি শাসকেরা নেই, উর্দুর দাপটের প্রশ্নও নেই। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর জাতিসত্তার মাতৃভাষা রয়েছে। সেসব জাতির মাতৃভাষা যাতে বিলুপ্ত হয়ে না যায় সেদিকেও একুশে ফেব্রুয়ারি আজ চোখ ফিরিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়ে। বাঙালি মহান জাতি, তাদের ভাষাচেতনা সমগ্র বিশ্বকে বরণ করে নিতে হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. দীনেশচন্দ্র সেন: *বৃহৎবঙ্গ*, প্রথমখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৫৩০।

২. দীনেশচন্দ্র সেন: *বৃহৎবঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩০।

৩. বিস্তারিত দেখুন, মোহাম্মদ হাননান: *স্বাধীনতার ৫০ বছর : শত ঘটনা শত কাহিনি*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃষ্ঠা ১০৮।

৪. সমীর সেনগুপ্ত: *সমকাল ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১১২।

৫. *রবীন্দ্র সমগ্র*, খণ্ড ১৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৮৩।

৬. *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২১১-২২০।

৭. *রবীন্দ্র সমগ্র*, খণ্ড ১৬, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৮. *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৯. *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮।

১০. *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯।

১১. *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯।

১২. বিস্তারিত দেখুন, অনীল মুখার্জি: *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*, দ্বিতীয় বাংলাদেশীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬২।

১৩. বিস্তারিত রয়েছে, মোহাম্মদ হাননান: *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, অখণ্ড: ১, ১৮৩০-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৩।

১৪. *একুশের সংকলন: গফরগাঁও থিয়েটার*, ১৯৯৯।

১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৯।

১৬. *দৈনিক বাংলার জনমত*, ৬ই এপ্রিল ১৯৯৪।

১৭. চিঠিপত্র ও অন্যান্য দলিলগুলোর বিস্তারিত দেখুন, মোহাম্মদ হাননান: *একুশে ফেব্রুয়ারি: জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, [প্রথম প্রকাশ ২০০০] বর্তমান মুদ্রণ ২০১৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১৫-১৫১।

ড. মোহাম্মদ হাননান: লেখক ও গবেষক

ভূমি মালিকের নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল সহযোগী ভূমি পিডিয়া

ভূমি সচিব মো. খলিলুর রহমান বলেন, ভূমি পিডিয়াকে ভূমি মালিকের জন্য ভূমি বিষয়ক একটি নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল সহযোগী হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। ২৫শে জানুয়ারি সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত 'ইন্টেলিজেন্ট ল্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' তথা 'স্মার্ট ভূমি পিডিয়া'র ওপর এক প্রশিক্ষণে সভাপতির বক্তব্যে ভূমি সচিব এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৯শে মার্চ ২০২৩ তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (AI enabled) ভূমি বিষয়ক জ্ঞানকোষ 'স্মার্ট ভূমি পিডিয়া' উদ্বোধন করেন। এখন এই সিস্টেমকে উন্নত করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ভূমি সচিব বলেন, ভূমি পিডিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কথোপকথনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেন ভূমি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরামর্শ পেতে পারেন তা নিশ্চিত করা। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভূমির 'প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি' (Institutional Memory) গড়ে তুলতেও অবদান রাখবে এই সিস্টেম। তিনি আরও বলেন, দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওপেন ডেটা গভর্নেন্স নীতি ও সরকারের তথ্য অধিকার বিষয়ক নীতি বাস্তবায়নেও ভূমি পিডিয়া ভূমিকা রাখবে।

এ সময় সচিব জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্বতন্ত্র মডেলের ভূমি পিডিয়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে (AI Model Training)। এছাড়া সক্রিয় শিখনের (Active Learning) জন্য ভূমি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও ভূমি সেবা গ্রহীতাদের ভূমি পিডিয়া ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রাথমিক অবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সিস্টেমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বহুমুখী এবং সময়সাপেক্ষ উল্লেখ করে সচিব আশা প্রকাশ করে বলেন, একবার স্থিতিশীল হয়ে গেলে ভূমি পিডিয়া সকলের ভূমি বিষয়ক নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। এ সময় বাংলায় লেখা ও বলার বৈশিষ্ট্যসহ ভূমি পিডিয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট 'ভূমি এডভাইজার' ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মার্ট ভূমিসেবা উদ্যোগের অন্যতম ভিত্তি বলে উল্লেখ করেন ভূমি সচিব।

প্রসঙ্গত, আইন, অধ্যাদেশ, রাষ্ট্রপতির আদেশ, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, ম্যানুয়াল, গেজেট ও অন্যান্য সকল ধরনের ভূমি বিষয়ক ডকুমেন্ট ভূমি পিডিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া পরবর্তীতে এখানে আলোচনার জন্য থাকবে ফোরাম এবং ব্লগ। ভূমি বিষয়ক বিবিধ বাস্তব সমস্যা এবং এর থেকে উত্তরণের উপায়ও জানা যাবে ভূমি পিডিয়া থেকে।

প্রতিবেদন: সাইমন ইসলাম

জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি : কপোতাক্ষ তীরের মধুপল্লী

ড. মোহাম্মদ আলী খান

ঢাকা কলেজের ছাত্র থাকাকালে (১৯৭৫) বইয়ের দোকানে একটি বই দেখে চোখ আটকে গিয়েছিল। বইয়ের নাম 'কবি শ্রীমধুসূদন', লেখক: মোহিতলাল মজুমদার। বিনিময় মূল্য ছিল: বারো টাকা। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের করকমলে স্নেহ-উপহার'। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ও কাব্য-নির্মাণশক্তির পরিচয় সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করি। তার আগে স্কুলে পাঠ্য ছিল বিখ্যাত কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ'। পরীক্ষার জন্য তা মুখস্ত করা ও সনেট সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জনের মধ্যে বিষয়টি গণ্ডিবদ্ধ ছিল। বহু বছর পরে আমার ছেলে তানভীর যখন স্কুলের ছাত্র, তখন বলল একদিন, কী কঠিন কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ', মুখস্তই হয় না। তখন তাকে বলি, চলো যাই সাগরদাঁড়ীতে কপোতাক্ষ নদের তীরে। সেখানে পৌঁছে সহজেই দেখা মিলল বহমান নদ আর তীরে উন্মুক্ত ফলকে লেখা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি। তানভীর ওখানে দাঁড়িয়েই কবিতাটি মুখস্ত করে ফেলল বিনাক্লেশে। এখনো সে ফলক জ্বলজ্বল করছে।

কপোতাক্ষ-নদ

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে;
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্র-ধ্বনি) তব কল-কলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে:—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু-নদ-দলে;
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম ভূমি স্তনে;
আর কি হে হবে দেখা? —যত দিন যাবে
প্রজা-রূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখী-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে:
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মহাকবি মাইকেল মদুসূদন দত্তের ২০০তম জন্মবার্ষিকী

কপোতাক্ষ নদ ততদিনে তার যৌবন হারিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্যোগে কপোতাক্ষের বুকে পালতোলা নৌকা আর শোভা পায় না, নেই উথালপাথাল ঢেউ। তবে নদীখাতটি রয়ে গেছে আগের মতোই। দুই পাশে সবুজ গাছ-গাছালি আর নান্দনিক গ্রামীণ পরিবেশ। এই নদের সাথে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে।

'কপোতাক্ষ নদ' মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদ। আদিকাল হতে গঙ্গা (পদ্মা) নদীর জলধারা মাথাভাঙ্গা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতো। স্বচ্ছ জলের সাথে পলল প্রবাহে যুগে যুগে বৃহত্তর খুলনা ও যশোর অঞ্চলের জনপদকে চাষাবাদের উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে কপোতাক্ষ নদ। এর পাখির (কপোত) চোখের মতো স্বচ্ছ জলের প্রবাহের কারণে এর নামকরণ 'কপোতাক্ষ' হয়েছে বলে মনে করা হয়। কপোতাক্ষ নদ মূলত মাথাভাঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার 'পদ্মা' নদীর ডান তীর হতে মাথাভাঙ্গা নদী উৎপন্ন হয়ে প্রায় ৯০ কিমি. দৈর্ঘ্যে প্রবাহিত হয়ে, বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় এসে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারতে মাথাভাঙ্গা নদী চুরনি নাম ধারণ করে ভাগীরথী চ্যানেলে পতিত হয়েছে।

কপোতাক্ষ নদ পূর্বে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার সন্নিকটে মাথাভাঙ্গা নদী হতে প্রবাহমান ছিল। পরবর্তী সময়ে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ায় এবং ব্রিটিশ আমলে রেললাইন নির্মাণের কারণে কপোতাক্ষ নদ মাথাভাঙ্গা নদী হতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কপোতাক্ষ নদ ঝিনাইদহ জেলার তাহেরপুর এসে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পূর্ব দিকের শাখাটি 'ভৈরব নদ' নাম ধারণ করে যশোর ও খুলনা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রূপসা নদীতে পতিত হয়েছে। পশ্চিম দিকের শাখাটি 'কপোতাক্ষ' নামেই যশোর জেলার চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, খুলনা জেলার পাইকগাছায় যেয়ে শিবসা নদীতে পতিত হয়েছে।

কপোতাক্ষ নদের বর্তমান অবস্থান

উৎস প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কপোতাক্ষ নদের উপরের অংশ 'মৌসুমী' নদীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া উৎস প্রবাহ না থাকায় জোয়ার-ভাটার পলি জমে 'কপোতাক্ষ নদ' একসময় বহু অংশে ভরাট হয়ে যায়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক ২০১২-২০১৭ সালে 'কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন (১ম পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭০ কিমি. দৈর্ঘ্যে খনন করা হয়। এর ফলে ২০১৮ সাল হতে যশোর জেলার মনিরামপুর পর্যন্ত নদটি পুনর্জ্জীবিত হয় এবং সক্রিয় জোয়ার-ভাটা ফিরে আসে। ২০২০ সালে 'কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন (২য় পর্যায়)' প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়, এর আওতায় কপোতাক্ষ নদ ১৪০ কিমি. দৈর্ঘ্যে খনন কাজ চলমান রয়েছে।

মহাকবি মধুসূদনের কৈশোর ও বাল্যকাল, কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী সাগরদাঁড়ীর জমিদার বাড়িতে কেটেছে। সে সময় কপোতাক্ষ নদ ধরে নৌপথে ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। কবির বিখ্যাত চতুর্দশপদী কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ'-এর পরতে পরতে এই নদের প্রতি সখ্য, ভালোবাসা ও বিরহের কথা বলেছেন। কবি ধর্মান্তরিত হয়ে বিদেশি বধূসহ সাগরদাঁড়ীতে এলে জমিদার পিতা তাকে গ্রহণ করেননি এবং বাড়িতে ঢুকতে দেননি। কবি এই সময় কপোতাক্ষ নদের তীরে তাবু নির্মাণ করে অপেক্ষা করেন পিতার অভিমান ভঙ্গের। কিন্তু পিতা কোনোভাবে তাকে মেনে না নিলে তিনি কপোতাক্ষের তীর হতে অস্থায়ী তাবু উঠিয়ে শেষ বারের মত সাগরদাঁড়ী হতে বিদায় নেন। এই কাহিনি অনেকটা জনশ্রুতি, বাস্তবে সঠিক নয় বলে জানা যায়। তবে কপোতাক্ষের তীরে যে ঘাট হতে কবি শেষ বিদায় নিয়েছিলেন

সেই ঘাট আজও 'শেষ বিদায়ঘাট' নামে পরিচিত। সেই ঘাট আজও সংরক্ষিত রয়েছে এবং কবির সম্মানে সেখানে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত রয়েছে; বটবৃক্ষটি এখনো আছে।

কপোতাক্ষ নদের তীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে করা হয়েছে। পাশেই আছে পিকনিট স্পট ও ডাকবাংলো। আর একটু গেলে দেখা মিলবে কবির স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ তীরের বটবৃক্ষ। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে সবুজ পাতারা দখিনা বাতাসে দোল খায়। 'বটবৃক্ষ' শীর্ষক কবির একটি সনেটও রয়েছে।

মধুপল্লী

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়িটি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত। এখানে বেশ কয়েকটি একতলা ও দোতলা ভবন রয়েছে। মহাকবি, নাট্যকার, বাংলা ভাষায় সনেট এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি, যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রামের এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল।

এই বাড়ি নির্মাণে ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রয়েছে মধুসূদনের পৈতৃক বাড়ি, তাঁর কাকার বাড়ি, বাড়ি সংলগ্ন পূজামণ্ডপ, পুকুরসহ উদ্যান। বর্তমানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়িটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত একটি পুরাকীর্তি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এখানে দুটো ভবন ও পূজা মণ্ডপ, সংস্কার-সংরক্ষণপূর্বক একটি পাঠাগার ও একটি জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়েছে কবির আবক্ষ ভাস্কর্য। রয়েছে মধুউদ্যান যাকে একসাথে মধুপল্লী নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

পুরানো একটি একতলা ভবনে সংরক্ষণ করা হয়েছে মধুসূদন দত্তের বসতবাড়িতে ব্যবহৃত খাট, টেবিল, আলনা, কাঠের সিন্দুক, লোহার সিন্দুক প্রভৃতি। জাদুঘরের সামনে ১৯৮৪ সালে শিল্পী বিমানেশ চন্দ্র, কবির একটি আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এছাড়াও মধুপল্লীর সীমানা প্রাচীরের ভিতরে নির্মাণ করা হয়েছে অপেক্ষাগার, প্রক্ষালনকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি।

মধুপল্লী এখন বহু পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত থাকে। বাড়ি ও সমগ্র স্থাপনা নিয়ে একটি জাদুঘর পরিচালনা করছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। সীমানা প্রাচীরবেষ্টিত এই কবির ভুবনজুড়ে রয়েছে কবির অনেক স্মৃতি। গ্রীষ্মকালে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৬টা, শীতকালে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরিদর্শনের সময়সূচি নির্ধারণ করা আছে। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার। বিশাল আমগাছগুলো এখনো প্রাচীন সময়ের কীর্তি জানিয়ে দিচ্ছে। মধুসূদনের বাল্যকালে গাছগুলো অনেক ছোটো ছিল, কালের বিবর্তনে ওরা এখন বৃদ্ধ, তবে এখনো ফলবান, আমগুলো অনেক বড়ো বড়ো হয়, দেখার মতো।

মধুপল্লীতে প্রথমেই চোখে পড়বে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পৈতৃক ভবন। একতলা বাড়ি, অনেকগুলো কক্ষ, খোলা প্রশস্ত বারান্দা, দরজাগুলো শক্ত কাঠের। কিছুটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। এই ভবনের বামপার্শ্বে রয়েছে একটি লাইব্রেরি। যে-কোনো পর্যটক এখানে এসে বই পড়তে পারেন। একটি আলমারিতে রয়েছে কবির বই এবং কবির উপর লেখা বই। এই ঘরটি কাছারিঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হতো কবির পিতার আমলে। মূল বাড়ির সামনে রয়েছে কবির একটি স্মৃতি ভাস্কর্য বা আবক্ষ মূর্তি ও কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

মূল বাড়ির পাশেই বেশ বড়ো পুকুর। পানির স্তর কখনো নেমে যায় না; মাছের অভয়াশ্রম যেন পুকুরটি। এটি বহিরঙ্গণের পুকুর, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা এখানে স্নান করতেন। বাড়ির পেছন দিকে, অন্দরমহলের পেছনে রয়েছে আর একটি পুকুর, সেখানে বাড়ির মেয়েরা স্নান করতেন। মূল ভবনে ঢুকলে চোখে পড়বে একটি স্থান, সাইনবোর্ড দেওয়া আছে 'কবির প্রসূতি স্থল', একটি বর্গাকারের মতো স্থাপনার মাঝে শোভা পাচ্ছে তুলসী গাছ। যে-কোনো পর্যটক এখানে এলে একটু থমকে দাঁড়ান এবং শিশুকবির ছবি মনে মনে আঁকেন। পুরাতন একতলা ভবনের বিভিন্ন কক্ষে থরে থরে সাজানো কবি-পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন অবজেক্ট। দেখা মিলবে কবির পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী বেশ কিছু সংগ্রহ। রয়েছে এখানে একটি কাঠের সিন্দুক, চারিপাশে নকশা করা। আরও আছে দত্ত পরিবারের ব্যবহৃত টিফিন ক্যারিয়ার, দেশজ দা, কাঠের আলমারি, আলনা, তৈজসপত্র, বিশাল খাট আর নস্টালজিয়ায় মোড়া কলের গান।

এছাড়া দেয়ালজুড়ে শোভা পাচ্ছে কবির বংশলতিকা, হাতের লেখা, জীবনকাহিনির অনেক দৃশ্যপটের ছবি যা মায়া জাগানিয়া। বাড়ির পেছন দিকে মিলবে অন্দরমহল, তার পেছনে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পুকুর। এই দুই ঘরের মাঝে পারিবারিক পূজামন্দির, তার সুউচ্চ গোলাকার স্তম্ভগুলো এখনো আকর্ষণীয়। মূল বাড়ির পেছনে রয়েছে কবির কাকার বাড়ি–একটি দ্বিতল ভবন। অন্দরমহল পেরিয়ে বাইরে আসার পথে চোখে পড়বে একটি ফুলগাছের গুঁড়ি, কালের সাক্ষী হয়ে মাটি কামড়ে রয়েছে, গুঁড়ি দেখে মনে হয় কাঁঠালীচাপা বা নয়নতারা ফুলের গাছ হতে পারে।

মধুপল্লীর সীমানার উল্টোদিকে রয়েছে মধুসূদন একাডেমি ও মধুসূদন মিউজিয়াম। স্থানীয় গুণিজন এই একাডেমির সাথে জড়িত। এখানে কবির স্মৃতিবিজড়িত অসংখ্য ছবির দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে। কয়েকটি আলমারির তাকে রাখা আছে মহাকবির উপর প্রণীত বইয়ের সারি। একাডেমির প্রতিষ্ঠাকাল ২৬শে জানুয়ারি ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ। তার পাশেই রয়েছে যশোর জেলা পরিষদ পরিচালিত মাইকেল মধুসূদন কালচারাল একাডেমী ও মধুমঞ্চ। এই মধুমঞ্চেই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং প্রতিবছর মধুমেলার অনুষ্ঠান শুরু হয় এই মঞ্চ থেকে। তার পাশেই রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সাগরদাঁড়ী এমএম ইনস্টিটিউশন, স্থাপিত ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। এই স্কুল মাঠেই হয় জমজমাট মধুমেলা।

শিশুকবির বাল্যকালে ফারসি ভাষা শেখার জন্য যেতেন শেখপুরা গ্রামে অবস্থিত একটি মসজিদের মক্তবে। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত সেই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি এখনো সংরক্ষিত আছে। মক্তবে যাঁর কাছে কবি ফারসি ভাষা শিখতেন তাঁর নাম মুফতি লুৎফুর হক। মসজিদের সামনে এ বিষয়ে একটি উন্মুক্ত ফলক আছে। উল্লেখ্য, যশোর জেলার পাশের জেলা খুলনা। সেই খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় রাড়ুলি কাঠিপাড়া গ্রামে ছিল জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের বাড়ি। তার কন্যা জাহ্নবী দেবীই কবির মা। অর্থাৎ এটাই কবির মামাবাড়ি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* একটি মূল্যবান গ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলাদেশের অনেক লেখক-গবেষক কবির উপর প্রচুর বই লিখেছেন এবং এখনো লিখছেন, প্রকাশিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ ও কবিতা। পরিবেশিত হয়েছে অনেক গান। একটি চমৎকার গ্রন্থ খসরু পারভেজের *মধুসূদন বিচিত্র অনুসঙ্গ*। প্রথম প্রকাশ ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ। সবচেয়ে প্রশংসিত গ্রন্থ বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ-এর *আশার ছলনে ভুলি*। কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই জীবনীগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। মাইকেলজীবনী পুনর্নির্মাণের নেপথ্য কাহিনি সম্বলিত তার আর একটি বই *মধুর খোঁজে*। প্রথম প্রকাশ ২০০৭ (অবসর, ঢাকা)। কথাসাহিত্যিক আন্দালিব রাশদী লিখেছেন উপন্যাস *শর্মিষ্ঠা*।

নীচে যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা একটি কবিতা দেওয়া হলো:

মধুর বাড়ি রসের হাড়ি

অলোক কুমার বসু

মধুর বাড়ি মেলা বসপে
তাইতি সুকজানরে কইছি সকাল কইরে
ঠিলে শুলোন সব ধুইয়ে পুড়া দিয়ে কানাচ পরাইয়ে খাঁজুর গাছ তলায় দিআসতি।
আর আমি মাটেরতে আইসে কয়ডা নাইরকেল পাইড়ে,
গা ধুইয়ে গুড়াতোক খাইয়ে দা ধারাইয়ে গাছ কাটতি যাবো।
সকালে এককাইটে নস ঝাইড়ে জ্বালাইয়ে
নাইরকেল দিয়ে পাটালি বাইন্দে
নিয়ে যাবো মধুমেলায়।
ঈদ, পুজোই আমাগে এলেকায় বেশি আইত্তো স্বজন আসে না,
আসে সব মধুমেলায়।
তাইতি এই সুমায় টাহা কড়ি হাতে রাকতিই হয়।
মেলার বাজারে যাবো শুইনে সুকজান পাচ ধইরেছে,
তালি কি মাইয়ে দুডো না যাইয়ে ছাড়বেন?
নিয়ে যাতিই হবেন,
মেলার মাঠের কুল, বোরোই, বাদাম, কটকটি, গুড়ের জিলেপি, গজা, দানাদার
গল্লা চিংড়ের মাথা দিয়ে ভাজা চপ
আমার সুকজানের একের পছন্দো
সে কতা কলি হবে না!
আর মাইয়েগের হাতে রঙ্গের ছাপ দিয়ে চুরি লাল ফিতে পরাইয়ে দিলি তারা বিজায় খুশি হইয়ে পড়ে,
এ খুশি টাহা দিয়ে কিনা যায় না।
আমাগের বাড়ি আইত্তো কুটুম আসলি ছিটে নুটি, কুহুড়োর গোস্ত, পিঠেপুলি আমরা খাতি দিয়েই থাহি, ইডা আমাগে কুটুমতালিউ কতি পারো।
কিন্তুক আর কতদিন যে এই কুটুমতালি করতি পারবানে তা কতি পারতিছনে।
সেদিন হাটে যাইয়ে দেকলাম পোলটির সের ১৮০ টাহা!
অথচ, নাইরকেল দিয়ে পাটালি বাইন্দে হাটে নিয়ে গেলি,
২০০ টাহা চালি সোগ্‌গুলি হা এইরে পড়ে!
তারপরেও কপোতাক্ষির পাড় বাইয়ে পায়ঁ হাঁইটে মদুর ঘাটেরতে হাত পা ধুইয়ে চোহি মুহি জলদে
বাদাম তলায় বইসে পড়বো পাটালির ধামা নিয়ে।
মধু কবির এলেকার আর এক মধু,
এই খাজুরির নসের স্বাদ এই পাটালির মদ্যি
খুঁইজে পাবে মধুর বাড়ি বেড়াতি আসা লোকজন,
তাইতি আমার এই আয়োজন।'

মহাকবি'র ওপর অনেক বই বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো :

লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	প্রকাশকাল
সৈয়দ আলী আহসান	কবি মধুসূদন	বইঘর, ঢাকা	১৯৫৭
	মধুসূদন : কবিকৃতি ও কাব্যদর্শ	মুক্তধারা, ঢাকা	১৯৭৬
নীলিমা ইব্রাহিম	বাংলার কবি মধুসূদন	পূর্ব পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা	১৯৬১
মোবাশ্বের আলী	মধুসূদন ও নবজাগৃতি	মুক্তধারা, ঢাকা	১৯৬৩
	মধুসূদনের বিশ্ব	বাংলা একাডেমি, ঢাকা	১৯৯৭
আহম্মদুল বারী	মধুসূদনের নাটক : প্রাসঙ্গিক বিবেচনা	শিল্পতরু, ঢাকা	১৯৯২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	মধুসূদন	বাংলা একাডেমি, ঢাকা	১৯৯৩
খালেদা বেগম	মধু কাব্যের নির্মাণশৈলী	ইমপিরিয়্যাল বুকস, রাজশাহী	১৯৯৩
মকবুল মাহফুজ	তিষ্ঠ ক্ষণকাল	কেশবপুর-যশোর	১৯৯৫
শামসুর রহমান লতা			
এম এ কাদির			
সৌরভ সিকদার	মধুসূদনের ভাষা ও শৈলী	বাংলা একাডেমি ঢাকা	২০০১
মোঃ আকতারুজ্জামান শেখ	মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য ও প্রহসনে লোক উপাদান	বাংলা একাডেমি ঢাকা	২০০৯
সাঈদা জামান মহসিন হোসাইন	বৈরীস্রোতে মধুসূদন	রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা	২০১১
খসরু পারভেজ	মধুসূদন : বিচিত্র অনুষঙ্গ	কথা প্রকাশ, ঢাকা	২০১৩
ফজল মোবারক	বিরুদ্ধ স্রোতে মধুসূদন	জ্ঞান বিতরণী ঢাকা	২০১৫
জুলফিকার মতিন	মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা	বাংলা একাডেমি	২০১৬
মুহম্মদ শফি	মধুকবির জীবনে নারী	আগামী প্রকাশনী ঢাকা	২০১৮
মনজুর রহমান	মধুসূদন : সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য ও দ্রোহ	সৃজনী, ঢাকা	২০১৮
রাহেল রাজিব	মাইকেল মধুসূদন দত্ত : সময় ও শিল্প	নৈঋতা ক্যাফে	২০১৯

বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ থেকে মাইকেল মধুসূদনের উপর স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম (First Day Cover) প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ডাকবিভাগ কর্তৃক বহুরঙা স্মারক ডাকটিকিটের প্রকাশকাল ২৯-০৬-১৯৯৬ খ্রি., মূল্যমান ৪ টাকা, ডাকটিকিটের আকার ৩২×৪২ এমএম এবং পারফোরেশন/ছিদ্রক দূরত্ব ১৩$^{৩}/_{৪}$×১৪$^{১}/_{২}$ মাইক্রন। ডাকটিকিটটির পুরো অংশ জুড়ে আছে কবির ছবি, ডান ও বাম পাশে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা কবির নাম ও জীবনকাল, নীচে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশ।

এই টিকিট ও উদ্বোধনী খামটি প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১২৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী ১৮৭৯-১৯৯৬ উপলক্ষে।

মধুমেলা

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার একটি যশোর। প্রাচীনতম এ জেলার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। এ জেলায় একসময় কর্মজীবনের শুরুতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যশোর জেলার অধীনে রয়েছে ৮টি উপজেলা। আটটির মধ্যে একটি হলো কেশবপুর। এই কেশবপুরের একটি ইউনিয়ন সাগরদাঁড়ী। ঢাকা থেকে সড়কপথে যশোরের দূরত্ব প্রায় ২৭০ কিমি.। কেশবপুরের দূরত্ব ৩৬ কিমি.। কেশবপুর উপজেলা হেডকোয়ার্টার্স থেকে সড়কপথে প্রায় ১৬ কিমি. গেলে সাগরদাঁড়ী গ্রাম। কেশবপুর উপজেলার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, জ্যোতি বসু, কবি মানকুমারী বসু প্রমুখ। এই কেশবপুরের সাগরদাঁড়ীতে প্রতিবছর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মধুমেলা। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যশোর জেলা প্রশাসন এই মেলার আয়োজনের দায়িত্বে থাকে। যশোর কালেকটরেটের যে সম্মেলন

যশোর কালেক্টরেট

কবির পারিবারিক পূজা মন্দির

পুকুর-অন্দরমহলের পিছনে

লাইব্রেরি

কবির কাকার বাড়ি

কক্ষ দুটি আছে, তার একটির নাম 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ', অন্যটির নাম 'সনেট'।

এই মধুমেলা উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, যশোর প্রতিবছর একটি বর্ণাঢ্য স্মরণিকা বের করে। স্মরণিকার শিরোনাম নেওয়া হয় কবির কোনো পঙ্‌ক্তি থেকে। যেমন– ২০২৩ সালে ছিল 'মধুকর', ২০০৫ সালে 'রেখো মা দাসেরে মনে', ২০০৬ সালে 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে'। ২০২৪ সালের মধুমেলা বিশেষভাবে আকর্ষণীয়, কারণ এ বছর কবির ২০০তম জন্মবার্ষিকী। মেলার শুরু ছিল ১৯শে জানুয়ারি ২০২৪ থেকে এবং তা নয়দিন ব্যাপী।

সাগরদাঁড়ীর মধুমঞ্চ থেকে মেলার উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। ১৯৭৩ সাল থেকে কবির জন্মতিথিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এবং জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ব্যাপকভাবে মধুমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সম্ভবত ১৮৯৩ সালেই স্থানীয় উদ্যোগে এরূপ মধুমেলার সূচনা হয়েছে বলে এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে। গবেষকদের লেখা থেকে জানা যায় যে, কপোতাক্ষের তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রামে প্রতিবছর ১২ই মাঘ থেকে ঐতিহ্যবাহী লোকমেলা শুরু হতো। প্রথম দিকে মধুমেলা, বাৎসরিক স্মৃতিসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দিনে দিনে সেই স্মৃতিসভা 'মধুসূদন স্মরণসভা', 'মাইকেল-উৎসব', 'মধু স্মরণোৎসব', 'মধুসূদন জন্মজয়ন্তী' এবং সবেশেষে 'মধুসূদন জন্মজয়ন্তী ও মধুমেলা'য় রূপ নিয়েছে। কবির প্রথম প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (প্রকাশকাল ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)-এর লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮৯০ সালে সাগরদাঁড়ীতে এসেছিলেন মধুস্মরণসভায় যোগ দিতে, সে সময় তিনি 'উৎসব' বা 'মেলা'ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং 'মধুমেলা' বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণমেলা।

মধুমেলা ঘিরে সাগরদাঁড়ী হয়ে ওঠে জমজমাট। সড়কপথে ভিড়ের কারণে হাঁটাচলাও কঠিন হয়ে পড়ে। চারদিকে এক উৎসবের আমেজের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন মেলামঞ্চে আয়োজন করা হয় আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর সারা মাঠ ও পথ-ঘাটে বসে দেশীয় শিল্পসামগ্রীর অসাধারণ ও জমজমাট মেলা। এই মধুমেলা কালের বক্ষ বিদীর্ণ করে এক নন্দিত সুষমা ছড়িয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নতুন করে চেনা ও জানার সুযোগ করে দেয়। একটি করে স্যুভেনির বের হয় প্রতিবছর। ২০২৪ সালে উদ্যোগে আছে জন্মদ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহাকবি মধুসূদন যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন, তার রেশ ও আমেজ কাল হতে কালান্তরে মধুমেলার বর্ণিল আয়োজনে নতুন করে সৃষ্টি করে নিত্যনতুন প্রাণের উন্মাদনা। শিল্পীরা গান গায়, কবি কবিতা লেখেন, মঞ্চস্থ হয় নাটক, রচিত হয় গবেষণাগ্রন্থ, প্রকাশিত হয় সচিত্র অ্যালবাম। সেই ধারাবাহিকতায় মহাকবির প্রতি বর্তমান নিবন্ধকারের শ্রদ্ধার্ঘ্য, কবিতার কয়েকটি চরণে:

মধু কবি

নদী তীর ঘেঁষে ঢেউয়ের ছন্দ দোলা
নীল আকাশের কোল জুড়ে সাদা কালো মেঘমালা,
সবুজ ঘাসের বুকে ঘাস ফড়িঙের খেলা
সারাটা বাগানে ফুল পাখিদের মেলা,
কী এক সুরের টানে মন ছুটে যায় দূরে বহু দূরে
কী এক ভাষার মায়া নিয়ে যায় মায়াবী বাসরে,
এই সুর এই ছন্দ এই তাল লয়
চুষে নেয় নিদারুণ খরা, বালুচর দূরে সরে যায়,
শুধু এসেছিল বলে একজন কপোতাক্ষ তীরে
বর্ণিল ফাগুন আসে ফিরে তাই বারে বারে,
মধু কবি শুধু সাগরদাঁড়ির শিশু নন, হয়ে যান সারা বাংলাদেশ
কপোতাক্ষ নদ যেন হয়ে যায় মেঘনা যমুনা পদ্মার অকূল অবকাশ।

তথ্যের উৎস

১. *আশার ছলনে ভুলি* (১৯৯৫), গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২. *কবি শ্রীমধুসূদন* (১৯৬৫), মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লি., কলকাতা।

৩. *বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে* (২০১০), মধুসূদন জন্মজয়ন্তী স্মরণিকা, জেলা প্রশাসন, যশোর।

৪. *মধুসূদন বিচিত্র অনুষঙ্গ* (২০১৩), খসরু পারভেজ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

৫. *মধুসূদন ব্যক্তি ও শিল্পী* (১৯৬৪), ক্ষেত্র গোপাল গুপ্ত শর্মা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৬. *মধুসূদন ও নবজাগৃতি* (১৯৬৩), মোবাশ্বের আলী, মুক্তধারা, ঢাকা।

৭. *মধুর খোঁজে* (২০১৫), গোলাম মুরশিদ, অবসর, ঢাকা।

৮. *মধুসূদন : কবি ও কবিতা* (২০০৮), সম্পা : খসরু পারভেজ, *মধুসূদন একাডেমী*, সাগরদাঁড়ী, যশোর।

৯. *মহাকবি মধুসূদন স্মৃতি অ্যালবাম* (২০২৩), সম্পা : মুফতি তাহেরুজ্জামান, সাগরদাঁড়ী, কেশবপুর, যশোর।

১০. *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (১৮৯৩) যোগীন্দ্রনাথ বসু, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, কলকাতা।

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক, গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, khanma1234@gmail.com

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বই পড়ার বিকল্প নেই

মুহা. শিপলু জামান

জীবনধারণের জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হয় আর মানুষের মনের জন্য দরকার সুখ, শান্তি ও আনন্দ। আর আনন্দের অফুরন্ত উৎস হলো বই। মনের খোরাক হিসেবে বই মানুষের পরম বন্ধু, যা একজন মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থভাবে সঙ্গ দিতে পারে। বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক আরনেস্ট হেমিংওয়ে বলেছেন, 'বইয়ের মতো এমন বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই'। সকল পরিস্থিতিতে বই আমাদের উত্তম আশ্রয়স্থল, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বই মানুষকে সৃষ্টির ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল রহস্য সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এছাড়া মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাসহ বিভিন্ন অনুভূতি, নানাবিধ সমস্যার স্বরূপ অনুধাবন ও সমাধান করতে বই অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। বই হলো সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস যেখান থেকে মনের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করে। মানুষের জীবনের আত্মশিখনের প্রধান উপাদান হচ্ছে বই। নীরব বন্ধু বই সঙ্গে থাকলে মানুষ কখনো নিঃসঙ্গ হয় না। বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে তা হতাশা, আলস্য-অবসন্নতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির অনন্য অবলম্বন হতে পারে। একটি ভালো বই বস্তুনিষ্ঠ সুন্দর ভাবনায় আচ্ছন্ন বা ব্যস্ত রাখার সার্থক ভূমিকা নিতে পারে। বই মানুষের নিজ নিজ স্বতন্ত্র সাধনা, ভাব ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ আর অন্তরে ধারণ করার সুযোগ দেয়– যা অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের নির্বাক সাক্ষী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক জাতির মেধা ও মননের আঁতুড়ঘর অর্থাৎ সকল মেধার সংগ্রহশালা হচ্ছে দেশের পাঠাগারসমূহ। মানুষের জাগতিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে উপনীত হওয়ার প্রধান সোপান হলো বই। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে বই। বইয়ের সাথে যার সম্পর্ক যত নিবিড় ও ঘনিষ্টতর হবে, সেই মানুষ তত উন্নত চিত্তের অধিকারী হবেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের যত জ্ঞানী-গুণিজন, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বিপ্লবী এবং স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, প্রত্যেকের জীবনে বইয়ের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'জীবনে মাত্র তিনটি জিনিসের প্রয়োজন– বই, বই এবং বই।'

বই মানুষের মনের পুষ্টি জোগায়, মনকে উদার ও মানবিক করে তোলে, জীবনের শাশ্বত সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে এবং মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, জীবনকে করে পরিমার্জিত। পণ্ডিতজন বলে গেছেন, একটি ভালো বই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যার সাথে কোনো পার্থিব ধনসম্পদের তুলনা হতে পারে না। ধনসম্পদ একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু একটি কালজয়ী বইয়ের আবেদন কখনো ফুরাবার নয়। প্রত্যেক ধর্মে পড়ালেখা ও জ্ঞানচর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফের নাযিল হওয়া প্রথম শব্দই ছিল 'ইকরা' অর্থ 'পড়'। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদ্যা অর্জনের জন্য সুদূর চীন যা আরব থেকে অনেক দূরে যেতে বলেছিলেন। বিশ্বে যারা বেশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে, তারাই তত শক্তিশালী হবে। তারাই বিশ্বের রাজনৈতিক ও জ্ঞানের জগৎ একসাথে অধিকার করে রাখবে। বই-বিমুখ জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। মার্কিন লেখক রে ব্রাডবেরি যথার্থই বলেছেন, 'একটি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে তোমাকে বই পোড়াতে হবে না। স্রেফ মানুষের বই পড়া বন্ধ করতে পারলেই হলো।' অর্থাৎ বই না পড়লে যে-কোনো জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি আপনা আপনিই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, কোনো যুদ্ধবিগ্রহের দরকার হবে না। নোবেল বিজয়ী রুশ কবি ও লেখক জোসেফ ব্রডস্কিও একই রকম কথা বলেছেন, 'বই পোড়ানোর চেয়েও বড়ো অপরাধ আছে। তার মধ্যে একটি হলো, বই না পড়া।'

জাতি হিসেবে বাঙালির আছে অনেক সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ভাষার জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে আমরা অকাতরে জীবন দিয়েছি। শিল্প-সাহিত্য চর্চায়ও বাঙালি অনেক এগিয়ে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে, প্রযুক্তি আর আধুনিকতার ছোঁয়ায়, স্যাটেলাইট আর পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাবে আমাদের বাঙালিয়ানা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। বই পাগল বাঙালি আজ বই বিমুখ হয়ে পড়ছে। সাহিত্য পড়ার চেয়ে ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন, ইন্টারনেট, ইউটিউবের দিকে মনোযোগ বেড়েছে। এছাড়া চলমান শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান প্রজন্মকে পরীক্ষার জালে বন্দি করে ফেলেছে। স্কুল, কোচিং আর প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়ার বাইরে ওদের ফেসবুক ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আগে পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে পড়ুয়াদের ভিড় থাকত, এখনো থাকে তবে পার্থক্য হচ্ছে এখন চাকরি প্রত্যাশীগণ প্রস্তুতি নিতে সেখানে যায়। একসময় বইমেলা ছিল লেখক-পাঠকদের মিলনমেলা, মানুষের ভিড়ে মেলায় প্রবেশ করা ছিল রীতিমতো এক যুদ্ধ। বইমেলায় এখনো অনেক লোকের সমাগম হয়। ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সবাই বইমেলায় জড়ো হয়, ঘুরে বেড়ায়, স্টলে স্টলে ঘুরে বই দেখে, সেলফি তুলে তারপর সযত্নে বই রেখে চলে আসে। আগে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে বই ছিল অন্যতম, এখন বই আর উপহার হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। আগের দিনে মানুষের শখ বা অবসরের একটি

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪-এ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর স্টল

বর্তমান প্রেক্ষাপটে–শিশু-কিশোর, যুবক-তরুণ প্রজন্মের মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব প্রীতির খেসারত দিচ্ছে জাতি। প্রতিটি পরিবারে মানবিক বোধহীন, দেশপ্রেমের চেতনাহীন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে আদর্শ-উদ্দেশ্যহীন ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ কারণে সমাজে অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। এই অবস্থার পরিত্রাণ পেতে বই পড়ুয়া প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। কেননা শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা জাতি চেনার উপায় হলো তাদের বই পড়ার অভ্যাস যার মাধ্যমে মানুষ কখনো ক্ষতির সম্মুখীন তো হবেই না বরং সে নির্মল আনন্দ লাভ করবে, তার জানার তৃষ্ণা তীব্রতর হবে, জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাবে, তার আত্মিক উন্নয়ন ঘটবে। মানুষের ভেতরকার সুকুমারবৃত্তিগুলো বিকশিত করতে বই পড়া প্রয়োজন। এজন্য বই পড়াকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হিসেবে নিতে হবে, বই পড়ুয়া জাতি গঠনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জাপানসহ উন্নত রাষ্ট্রসমূহ বই পড়ুয়া জাতি, তাঁরা রাস্তায় চলার পথে বাস-ট্রেনে বসে বই পড়তে পছন্দ করে। অধিকহারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং জেলায় জেলায় বইমেলা আয়োজন এই সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম উপায়।

অন্যতম কাজ ছিল বই পড়া আর এখন মোবাইল টিপেই অবসর পাওয়া যায় না। এভাবেই আমাদের নতুন প্রজন্ম জ্ঞানচর্চার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। শিশুরা ভবিষ্যতে জাতির নেতৃত্ব দিবে কিন্তু তারা যদি বই-বিমুখ হয়, তাহলে আমাদের ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে। তাই আমাদের সকলকে এখনই ভাবতে হবে কীভাবে নতুন প্রজন্মের বই-বিমুখতা দূর করে তাদেরকে বই পড়ায় অভ্যস্ত করা যায়। আর অবশ্যই একাজ শুরু করতে হবে 'শ্বাশত বিদ্যালয়' বা পরিবার থেকে, এছাড়া স্কুলের শিক্ষকদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সরকার দেশে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করছে কিন্তু সেই তুলনায় বই-প্রীতি বাড়ছে না। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে, তাই বই পড়ুয়া প্রজন্ম গড়তে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাড়াতে হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিষয়ভিত্তিক এবং ঋতু ভেদে বইমেলা আয়োজন করা, পাড়ায়-মহল্লায় পাঠক সমাজ গড়ে তোলা, জেলা-উপজেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠাগারগুলোকে সমৃদ্ধ ও কার্যকর করা, বই পড়ার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কার্যক্রম নতুন প্রজন্মকে বই পাঠে উৎসাহিত করতে পারে। একটা সময় ছিল যখন মা-বাবারা নিজেরাও বই পড়তেন এবং সন্তানদের পাশে বসিয়ে তাদেরকেও বই পড়ে শোনাতেন। কিন্তু কালের পরিহাসে এখনকার মা-বাবারা সন্তানের হাতে বই না দিয়ে তুলে দিচ্ছেন মোবাইল ডিভাইস, যার ফলে বর্তমান প্রজন্ম হয়ে উঠছে গ্রন্থ-বিমুখ। তাই শিশুদের স্ক্রিন টাইম কমানো অর্থাৎ মোবাইল, ট্যাব বা ল্যাপটপ থেকে আমাদের সন্তানদের দূরে রেখে বই পড়ায় আকৃষ্ট করতে হবে। এছাড়া যান্ত্রিক যুগের ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে বই-বিমুখ হচ্ছি। তবে মানুষের মধ্যে যখন বই পড়ার তীব্র ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তখন শত ব্যস্ততার মধ্যেও সে বই পড়ার সময় বের করে নেয়। বিশ্ববিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী ওয়ারেন বাফেট যিনি মহাব্যস্ত একজন মানুষ, তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সফলতার চাবিকাঠি কী? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'প্রতিদিন ৫০০ পৃষ্ঠা পড়'।

বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অমর একুশে বইমেলা। এটি আমাদের প্রাণের মেলা, হৃদয়ের স্পন্দন। আমাদের আবেগ জড়িত মনের অনুভূতি আদান-প্রদানের মেলা অমর একুশে বইমেলা। অমর একুশে বইমেলার পথিকৃৎ হলেন মুক্তধারা ও পুঁথিঘর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী প্রয়াত চিত্তরঞ্জন সাহা। তিনি সর্বপ্রথম আনুমানিক ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণের বটতলায় মাটিতে চট বিছিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ত্রিশ-বত্রিশটির মতো বই বিক্রি শুরু করার মধ্যদিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এরপর থেকে তিনি একাই ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বইমেলা চালিয়ে যান। তিনি ১৯৭৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বই বিক্রির অনুমতি লাভ করে

সচিত্র কিশোর পত্রিকা নবারুণ হাতে খুদে পাঠক

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুনমাত্রা লাভ করতে সক্ষম হন, ১৯৭৬ সালের দিকে অন্যান্যরাও অনুপ্রাণিত হয়ে তার সাথে যোগ দিতে শুরু করেন। এরপর ১৯৭৮ সালে সরকার একে পূর্ণাঙ্গ বইমেলা হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। ১৯৭৯ সালে বইমেলার সাথে সম্পৃক্ত হয় চিত্তরঞ্জন সাহার প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি'। ১৯৮৪ সালে গ্রন্থমেলার জন্য সরকারিভাবে আইন পাস করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ হওয়া সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেক শহিদদের স্মরণে নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এছাড়া বিশ্বের অনেক দেশেই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, প্রত্যেক মেলার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ধরনে পার্থক্য থাকলেও পাঠকদের বই পড়ায় উৎসাহিত করতে সকলের আবেদন সমান।

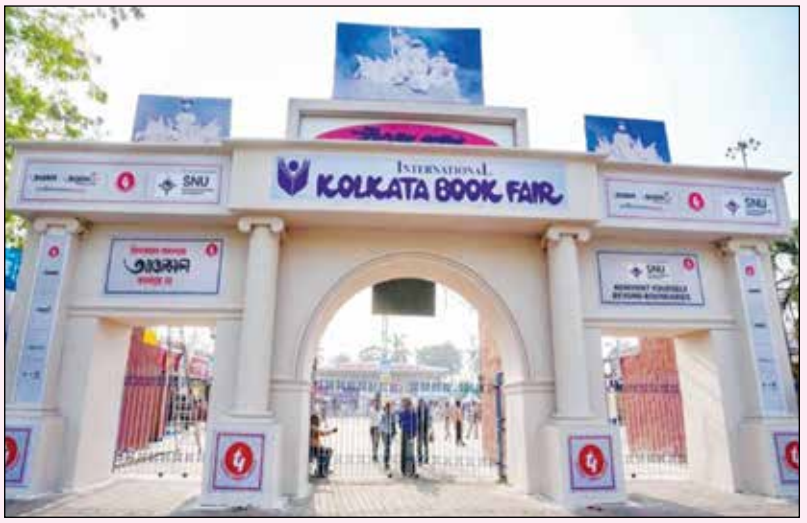

আসেন বিশ্বের বিখ্যাত কিছু বইমেলা সম্পর্কে জেনে নেই। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাকে বলা হয় বাণিজ্যিক দিকে থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আর দর্শনার্থীর আগমনের দিক থেকে ইউরোপে এর অবস্থান দ্বিতীয়। ১০০টিরও বেশি দেশ থেকে অন্তত ৭,০০০ সংস্থা অংশ নেয় এই মেলায় যেখানে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে। প্রকাশনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বাণিজ্যের জন্য এই বইমেলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইমেলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই কায়রো ইন্টারন্যাশনাল গ্রাউন্ডে ১৯৬৯ সাল থেকে বড়ো পরিসরে 'কায়রো ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার' নামে একটি বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা বিশ্বের শীর্ষ বইমেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং আরব বিশ্বে সেরা বইমেলা। মেলায় প্রতিবছর গড়ে ২০ লক্ষ মানুষ অংশ নেয়। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বইমেলার স্থানটি দখল করে আছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। কারণ এখানে সবচেয়ে বেশি পাঠক সমাবেশ ঘটে। আবার অনেকে এই বইমেলাকে অবাণিজ্যিক বইমেলা হিসেবেও সম্বোধন করে থাকেন। মেলায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় কলকাতা বইমেলায় যেখানে বাংলাদেশের জন্যও একটি আলাদা প্যাভিলিয়ন থাকে। ইউরোপের বইপ্রেমীদের অন্যতম বৃহৎ মিলনমেলা ঘটে লন্ডন বইমেলায়। ১৯৭১ সালে এই মেলার শুরু। একশোটিরও বেশি দেশের প্রায় ২৩ হাজার প্রকাশক, গ্রন্থ বিক্রেতা, লিটারারি এজেন্ট, গ্রন্থাগারিক, গণমাধ্যম ও শিল্প সরবরাহকারী এই মেলায় অংশ নিয়ে থাকেন। আর্জেন্টাইন সোসাইটি অব রাইটার্স-এর প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা 'ফান্দাসিঁও এল লিব্রো' আয়োজন করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান বইমেলা বুয়েন্স আয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার। ১৯৭৫ সাল থেকে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স শহরে অনুষ্ঠিত মেলাটি আর্জেন্টাইন রুরাল সোসাইটির ৪৫ হাজার বর্গমিটার এলাকা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রচুর দেশি-বিদেশি লেখকের মিলনমেলা ঘটে। শিশুসাহিত্যের জন্য 'বলোনিয়া চিল্ড্রেনস বুক ফেয়ার' একটি প্রধান বইমেলা। ১৯৬৩ সাল থেকে প্রতিবছর মার্চ এবং এপ্রিলের চার দিন এই মেলা ইতালির বলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা যেখানে প্রায় ১ হাজার ৫০০ প্রকাশক অংশ নেন। শিশুসাহিত্য, শিশু চলচ্চিত্র এবং

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর স্টল

এনিমেশন নিয়ে যারা বিশ্বজুড়ে কাজ করেন তাদের জন্য এই মেলা যেন তীর্থস্থানীয়। বিশ্বজুড়ে সবার কাছেই বইমেলাটি অসম্ভব জনপ্রিয়। তারাই মূলত এখানে শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসেন। প্রতিবছর নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত হয় মিয়ামি আন্তর্জাতিক বইমেলা। পৃথিবীর অন্যতম বইমেলা বসে মস্কোতে। প্রতিবছর সেপ্টেম্বরের ৩ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে মস্কো এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় মস্কো ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার বা মস্কো আন্তর্জাতিক বইমেলা। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই মেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নানা ধরনের ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠক, লেখকদের নিজস্ব আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। স্প্যানিশ ভাষাভাষীদের জন্য সবচেয়ে প্রখ্যাত বইমেলা হলো গুয়াডাললাজারা বইমেলা। প্রতিবছর শেষ দিকে এই মেলার আয়োজন করা হয়।

এভাবে বিষয়ভিত্তিক বইমেলা আয়োজন করে, মেলাকে উৎসবে পরিণত করে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি বই পড়ার সোনালি অভ্যাস। নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধারণ করে একে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে আর এজন্য প্রয়োজন নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন সত্যিকারের আলোকিত মানুষ; যারা দেশকে ভালোবাসবে শর্তহীন সরলতায়, শুধুই এ দেশের কাদা-মাটিতে, জলে-হাওয়ায় বেড়ে ওঠার কৃতজ্ঞতায়। আর এটি করতে হলে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো পড়া। নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের বই পড়তে হবে। পড়তে হবে, গভীর অভিনিবেশে, মেধা ও হৃদয়ের যুগপৎ ব্যবহারে। বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'অন্তত ষাট হাজার বই সাথে না থাকলে জীবন অচল।' জন ম্যাকলে বলেন, 'প্রচুর বই নিয়ে গরিব হয়ে চিলেকোঠায় বসবাস করব, তবু এমন রাজা হতে চাই না, যে বই পড়ে না।' একেকটা বই একেকটা জানালা। দরজা-জানালা বন্ধ আলো-বাতাসহীন ঘরে থাকতে গেলে দমবন্ধ হয়ে আসে। আমাদের বাঁচার জন্য, স্বস্তির ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জানালা খুলতে হয়, তেমনিভাবে সুন্দর পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবনের জন্য মনের জানালা খুলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে বই-ই হতে পারে একমাত্র প্রধান অবলম্বন। অতএব, আমাদের বই কেনার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করলে চলবে না। বই হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি আবার আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছে অমর একুশে বইমেলা। পাঠক-লেখকের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে প্রাণের মেলা; ডিজিটাল মাধ্যমের জয়জয়কারে কাগজে বই টিকে থাকবে স্বমহিমায়– এটাই সকলের প্রত্যাশা। আসুন শিশুদের নিয়ে বইমেলায় যাই, বই পড়ার অভ্যাসকে শানিত করি আর পরিবারে বই পড়ার চর্চা বাড়িয়ে দেই। তাহলেই গড়তে পারব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত, সমৃদ্ধ– স্মার্ট বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র

১. বইমেলা ও আমাদের সংস্কৃতি, আহমেদ উল্লাহ, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২০;
২. আলোর সন্ধানে: সংস্কৃতির বিকাশে বইমেলা, ফয়জুন্নেসা মণি, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮;
৩. বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বইমেলা, রায়হান আহমেদ তপাদার, ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৩;
৪. বইমেলা পরিণত হোক বই পড়ার উৎসবে, সালাউদ্দিন আইয়ুবি;
৫. ক্রমেই বাড়ছে বই বিচ্ছিন্নতা, এ কে এম শানাওয়াজ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮;
৬. বই পড়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠুক, নুসরাত জাহান ঐশী, ১২ই জুন ২০২২;
৭. বই হোক নিত্যসঙ্গী অর্থবহ হোক প্রাণের মেলা, রেজাউল করিম খোকন, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২।

মুহা. শিপলু জামান: উপ-প্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা, shizaman2015@gmail.com

ভাষা শহিদদের প্রতি ১৩ বিদেশি সামরিক কর্মকর্তার শ্রদ্ধা

ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ১১টি দেশের ১৩ জন সামরিক কর্মকর্তা। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল হামিদুল হকের নেতৃত্বে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান তারা। এ সময় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী শহিদদের প্রতি তারা ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর বিদেশি সামরিক কর্মকর্তারা জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাখা পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ডিজিএফআই মহাপরিচালক মেজর জেনারেল হামিদুল হক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যারা আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের সামরিক প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন। তারা ডিজিএফআইর ব্যবস্থাপনায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

এসব কর্মকর্তা ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দূতাবাসের সামরিক প্রতিনিধি (ডিফেন্স অ্যাটাশে) হিসেবে কর্মরত আছেন। শ্রদ্ধা নিবেদনে ১১টি দেশের ১৩ জন সামরিক কর্মকর্তা হলেন: অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি লে. কর্নেল জন ডেম্পসি, চায়নার প্রতিনিধি সিনিয়র কর্নেল ডু জিংসেন, ভারতের প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার মানমিত সিং সাবারওয়াল, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি কর্নেল আজওয়ান আবদি, মিয়ানমারের প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার সো ন্যুয়েত, নেপালের প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার রোশান শামসের রানা, প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি কর্নেল মাহমুদ সারাওনাহ, রাশিয়ার প্রতিনিধি কর্নেল সারগেই ভিক্টরোভিচ নেয়দেনভ্ ও লে. কর্নেল আলেক্সি ইয়্যুরিভিচ তেরেকভ, তুর্কির প্রতিনিধি কর্নেল এরদাল শাহীন, যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি লে. কর্নেল জন ক্র্যাফোর্ড ম্যাকলিলান স্কর্ট, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লে. কর্নেল মাইকেল এরিক দ্যিমেশেই ও মেজর ইয়ান লিওনার্দ।

প্রতিবেদন: আকাশ আহমেদ

অমর একুশে বইমেলা এবং প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা

প্রণব মজুমদার

সময়টা বেশ আগের। চল্লিশ বছর পূর্বের। ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। হিসাব শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর পড়াশোনা। পাশাপাশি চলছে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা। মফস্বলে থাকতেই জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে লেখা ছাপা হয়। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে শত শত লেখা। পুরানো ঢাকার বাংলাবাজারে যাওয়া-আসা হয়। গাইড বই লিখি। বইয়ের প্রুফও দেখি। এক ফর্মা ১০০ টাকা। জগন্নাথ হলে আবাস। হলে নিয়ে আসি কাজ। সপ্তাহ পরে তা দিয়ে আসি। পুঁথিঘর লিমিটেড বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নারায়ণ সরকার। লক্ষ্মীবাজারে তার পুত্র-কন্যাকে পড়াই। ওনার মাধ্যমেই একসময় পরিচয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চেতনার অন্যতম প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা-এর স্বত্ত্বাধিকারী প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার সঙ্গে।

আপাদমস্তক পণ্ডিত মুক্তধারার পরামর্শক ব্যাকরণ বিশারদ শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সঙ্গে সেখানেই আলাপ হয়। বিশুদ্ধভাবে বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দিতে তিনি পারঙ্গম এবং যোগ্য প্রাজ্ঞজন। আমাকে তার আলোচনার নিমগ্ন শ্রোতা পেয়ে নমস্য মহোদয় বেজায় খুশি! এই জ্ঞানীজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে আস্তে আস্তে। অনেকদিন ধরে লিখছি জেনে লাহিড়ী বাবু বিস্মিত! পরিচয়ের বেশ কয়েক বছর পর তিনি একদিন বললেন সাহিত্যের যে-কোনো শাখার অনেক লেখা একসঙ্গে লিখে দিতে। একে নাকি পাণ্ডুলিপি বলে! যেই কথা সেই কাজ! বেশ উৎসাহ নিয়ে প্রায় তিন মাস ধরে হাতে লিখে সম্পন্ন করি তা। ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধের ৪টি পাণ্ডুলিপি নিয়ে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে উপস্থিত হই ওনার মাধ্যমে বইয়ের নিষ্ঠাবান পাঠক চিত্তরঞ্জন সাহার কাছে। অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তখন মুক্তধারা সম্পাদনা পরিষদের বড়ো কর্তা ব্যক্তি। তিনিও পাণ্ডুলিপিগুলোর অনুমোদন দেন। ১৯৮৮ সালে ঢাকায় ভয়াবহ বন্যা হয়। পুরানো ঢাকার ফরাশগঞ্জ ও বাংলাবাজারের দোকানপাট বানের জলে ডুবে যায়। মুক্তধারা প্রকাশনালয় বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় উৎকণ্ঠায় একদিন চিত্তবাবু আমায় বললেন, 'আর এনে জল ঢুকি গ্যাছে! আই পাইতাম ন, অন্ন পাফলিসর দেহি হাফাই হালান!' তার উচ্চারিত নোয়াখালীর এমন সংলাপে কষ্টের মধ্যেও হেসেছিলাম সেদিন আমি! সাংবাদিকতাও চলছে আমার। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে কবি আবদুল সাত্তার ও কবি খালেদা এদিব চৌধুরীর সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশ হয় *সচিত্র বাংলাদেশ* ও *নবারুণ*। প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও প্রিয় মানুষ নামে দুইটি বিভাগ রয়েছে। সেখানে সাত্তার ভাই ও খালেদা আপা নিয়মিত লেখার কাজ দেন। খালেদা আপা বললেন, মুক্তধারা-এর কর্ণধার চিত্তরঞ্জন সাহার ওপর সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা দিতে। তা প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিভাগে ছাপা হবে। সাক্ষাৎকার দিতে রাজি ছিলেন না তিনি। এর কারণ তার প্রকাশনালয় থেকে আমার বই প্রকাশ হচ্ছে না। কিন্তু আমার সানুগ্রহ অনুরোধ ফেলতে পারেননি মুক্তিযুদ্ধ মনস্ক সাধারণ মানুষ চিত্তরঞ্জন সাহা। শুরু হলো কথা বিনিময়। ছোটোবেলার তার সেই সোনাঝরা দিন। কষ্টের সংগ্রামী জীবন!

দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম পুরোধা মানুষটির জন্ম ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। পৈতৃক ভিটা নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার লতিফপুর গ্রামে। দুই বোন, চার ভাইয়ের মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয়। সাহা সম্প্রদায় মানেই ব্যবসায়ী পরিবার। মা-বাবা উভয় দিকের আত্মীয়স্বজনই ব্যবসায়ী। সকলেই মূলত কাপড়ের ব্যবসায়ী। দাদুর ছিল সুদের ব্যাবসা। এমন পরিবারে জন্ম নিলেও বালকবেলা থেকেই বইয়ের পোকা হয়ে ওঠেন চিত্তরঞ্জন। পড়া অবস্থায়ই তার শেষ হয়ে যায় বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও মানিক!

কীভাবে এটা সম্ভব হলো? বললেন তার উত্তর। একই গ্রামের জমিদার হেমেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ির তিনজন ছিলেন বিলাতফেরত। সবাই পড়ত বেশ। তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে হলো বইয়ের প্রতি ভালোবাসা। শুধু বইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়; খেলাধুলার প্রতিও ছিল টান। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার কাটা আর ছিল ফুটবল খেলা। ফুটবল ছিল তার অনন্ত প্রাণ। স্কুল ও কলেজ টিমে খেলেছেন অনেক। রক্ষণভাগে খেলতেন তিনি।

– বই ও ফুটবল খেলা দুটিকে মেলাতেন কীভাবে?

– দুটোর মধ্যে পার্থক্য নেই! দুটোই মনে আনন্দ দেয়। বইটা শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে গেলেও ফুটবল ছেড়ে দিতে হয় কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

লতিফপুর গ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণি পাস করার পরই মাতামহী নাতি চিত্তকে নিয়ে আসেন তার কাছে; কল্যাণদি গ্রামের চন্দ্রগঞ্জ বাজারে। ভর্তি করে দেওয়া হয় কল্যাণদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর মুহম্মদপুর রামেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়। বাবা কৈলাস চন্দ্র সাহার কাপড়ের ব্যাবসা খারাপের দিকে গেলে তিনি শ্বশুরের

ব্যাবসা দেখাশোনা শুরু করেন। মা তীর্থবাসী সাহা ছিলেন বাবার একমাত্র মেয়ে। তাই এতে তেমন কোনো অসুবিধা হলো না তার। চিত্তরঞ্জনের পড়ালেখার খরচও চালাতেন দাদু। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রামেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করার পর তিনি কলকাতায় চলে যান। ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। জড়িয়ে পড়েন ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে। কিন্তু কলকাতার জীবন খুব একটা স্থায়ী হয়নি তার। ১৯৪৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর দাদু চিঠি লিখে ডেকে পাঠান। 'সাহার ছেলের লেখাপড়া অনেক হয়েছে, বাড়ি এসে এবার ব্যাবসায়ে মনোযোগ দাও। টাকা উপার্জন করো।' দাদুর কথা শুনে ভাবনায় পড়ে যান তিনি। আরও লেখাপড়া করতে চাইলেও বাড়ি থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। অগত্যা ফিরে আসতে হয় তাকে। কিন্তু ব্যাবসা নয়, বিএ (পাস) ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান চৌমুহনী কলেজে। দিদির বাড়িতে খাওয়াদাওয়া, আর শিক্ষা খরচ চালাতে বেছে নেন গৃহশিক্ষকতা। সে সময় গৃহশিক্ষকতা করে চৌমুহনীতে যে পয়সা আসত তা দিয়ে চলা বেশ কষ্টকর হতো। সে কষ্টের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালে বিএ (পাস) করেন তিনি। তারপর শুরু হয় ব্যাবসা।

– দুর্ঘটনাবশত আমি ব্যবসায়ী! হতে চেয়েছিলাম চাকরিজীবী বা অন্য কিছু। পরিবারের ক্রমাগত চাপে কোনোক্রমে ডিগ্রি পাস করা গেলেও ব্যাবসাটাকে আর দূরে রাখা গেল না। বাবার ব্যাবসার সূত্র ধরে চন্দ্রগঞ্জ বাজারে কাপড়ের ব্যাবসা। প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে মাতামহের কাছ থেকে পান ৫ হাজার টাকা। যার ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন সে মালিককে ব্যাবসায়ের অংশীদার করে নেন তিনি।

কাপড়ের ব্যাবসা ভালো করলেও ব্যাবসাটা মোটেও পছন্দ হতো না তার। মাথার ভেতর ঘুরত অন্য কিছু করার চিন্তা। একসময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, 'যদি ব্যাবসা করতেই হয়– তাহলে বইয়ের ব্যাবসা করব। কিন্তু কাউকে তা বলা যাবে না। জানলেই সবাই বাগরা দেবে।' সবার অজ্ঞাতে চৌমুহনীতে মাসিক ৬০ টাকা ভাড়ায় একটি দোকান নেন। প্রাথমিক পুঁজি ছিল পাঁচ হাজার টাকা। ঢাকা থেকে বই কিনে নিয়ে গিয়ে চৌমুহনীতে বিক্রি করতেন। চৌমুহনীর একমাত্র বইয়ের দোকান বলে বেশ চলত। পরিবারের লোকজন একসময় জেনে যায়। তার আগ্রহ দেখে পরে আর কিছু বলেনি। ব্যাবসাটা ভালোই চলছিল বলা যায়। কিন্তু ব্যাবসা শুরুর পাঁচ মাসের মধ্যে দোকানে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভেঙে পড়েননি তিনি। আবার নতুন করে শুরু করলেন বইয়ের ব্যাবসা। বই কিনে এনে বিক্রিতে তেমন লাভ কোথায়। নিজে প্রকাশ করে তা বিক্রি করলে অধিক লাভ। সে চিন্তায় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পুঁথিঘর নাম দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য দুটি নোট বই প্রকাশ করলেন তিনি। ১৯৫২-তে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য 'টেস্ট পেপারস মেড ইজি' বের করলেন। চার জন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন যাদের কাজ হলো জেলায় জেলায় বই বিপণন এবং বিজ্ঞাপন ও পোস্টারের মাধ্যমে পুঁথিঘরের প্রচার করা। পুঁথিঘর বিন্দু থেকে মহীরহে পরিণত হতে লাগল। ১৯৫১ সালে পুঁথিঘরের যাত্রা শুরু হলেও নিজস্ব কোনো ছাপাখানা ছিল না। অন্যের ছাপাখানায় বাকিতে বই ছাপতেন তিনি। ১৯৫৪ সালে বাসন্তী প্রেস নামে চৌমুহনীর একটি ছাপাখানা ভাড়া নেন। পরের বছর মালিক প্রেসটি বিক্রির প্রস্তাব দিলে তিনি সাড়ে সাত হাজার টাকায় তা কিনে নেন। ছাপাখানাটি চালাত সাতজন কর্মচারী। ১৯৫৬ সালে একটি বাড়ি ভাড়া করে ছাপাখানাটি স্থানান্তর করেন। নাম রাখেন ছাপাঘর। এক বছর পর গড়ে তোলেন বই বাঁধাইয়ের জন্য পৃথক শাখা বাঁধাই ঘর। এখানে শুধু বই বাঁধাই হতো। ব্যাবসার সুবিধার্থে একই সময়ে ঢাকার পাটুয়াটুলিতে দোতলায় একটি ঘর ভাড়া নেন। শুধু পাইকারি বিক্রি হতো এখান থেকে। কর্মদক্ষতা ও ব্যাবসায়িক বুদ্ধিতে ব্যাবসা কমেই স্ফীত হতে লাগল। পাটুয়াটুলির গুদামঘর থেকে বাংলা বাজার এবং ১৯৬২-তে প্যারীদাস রোডে স্ত্রী বিজলী প্রভার মালিকানায় ঢাকা প্রেস নামে মাঝারি আকারের একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। সেখানে সারা বছর পুঁথিঘরের বই-ই ছাপা হতো। ১৯৬৭ সালে পুঁথিঘর রূপ লাভ করে লিমিটেড কোম্পানিতে। পুঁথিঘর, ছাপাঘর, বাঁধাই ঘর ও ঢাকা প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয় চন্দ্রশেখর কাব্যভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থালয়। পুঁথিঘরের নবনাম– 'পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড'। চিত্তরঞ্জন সাহা হলেন পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এ সময় ফরাশগঞ্জে ৪৫ কক্ষের একটা তিনতলা বাড়ি ভাড়া নেন। এটিই পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয়। ১৯৬৭-তে সপরিবার ঢাকায় এসে এ বাসার তিনতলায় থাকা শুরু করেন তিনি। আস্তে আস্তে পুঁথিঘরের কর্মচারীর সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়ে যায়। বই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন সাহা দর্শন আশ্রিত যে কথা সেদিন বললেন তা এক অনুপম সাহিত্য। 'পশুপাখি জন্মলাভের কিছুদিন পর পশুত্ব অর্জন করে। কিন্তু মানুষ মানবশ্রেণিভুক্ত হয় বটে; সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না। মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য তাকে সাধনা করতে হয়। সে সাধনার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে বই।' মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেনও তিনি। সত্তরে এসে সাহিত্য বিষয়ে বই প্রকাশের জন্য গড়ে তোলেন পুঁথিঘর সাহিত্য সংসদ। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশ করেন ড. নীলিমা ইব্রাহিম, শওকত ওসমান, ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ ও সরদার জয়েনউদ্দিনসহ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের বেশ কিছু বই। স্বাধীনতা যুদ্ধে সবই খোয়া যায়।

– কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন?

– পরিবারের সবাই ছিলেন গ্রামের বাড়ি। একাত্তরের মার্চের প্রথম দিকে চৌমুহনী থেকে ঢাকা এলাম ব্যাবসার কাজে। সভা-মিছিল আর গুলিতে উত্তাল ঢাকা। সারা দেশ। বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণে দিয়েছেন স্বাধীনতার ডাক। আইয়ুব খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চলছে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। টানটান উত্তেজনা, কখন কী হয়ে যায়! অবশেষে নেমে এলো পঁচিশে মার্চের সেই কালরাত। ভাগ্য ভালো যে প্রাণে বেঁচে গেলাম। প্রতিষ্ঠানের কজন কর্মচারীর সহযোগিতায় ঢাকা থেকে পালিয়ে চৌমুহনী। স্ত্রী-পরিবার সবাই ভয়ে আছে! অস্থির কখন বাড়ি ফিরব? নৌকা করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম। কখনো গা-ঢাকা দিয়ে, কখনো দৌড়ে পালিয়ে অবশেষে ১১ দিন পর পৌঁছলাম নিজের বাড়িতে। ততদিনে আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই পালিয়েছেন দেশ ছেড়ে ভারতে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে আমিও পালালাম। আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে আগরতলা। পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছি ৫ই মে। দেশ রয়ে গেল হানাদারের দখলে। জ্বলছে স্বদেশ, পুড়ছে সাত পুরুষের বাস্তুভিটা। অস্থিরতা বাড়তে থাকে আমার। ১০ই মে চলে যাই কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে। দেশের জন্য একটা কিছু করতে হবে। যোগাযোগ বাড়তে থাকে দেশ ছাড়া সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। ২৮শে মে পার্ক সার্কাসে সৈয়দ আলী আহসানের বাসায় সমবেত হন প্রায় ৫০ জন কবি, কথাসাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী। ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, ড. আনিসুজ্জামান, সত্যেন সেন, ড.

সন্‌জীদা খাতুন প্রমুখ। আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারা লিখবেন। আর তা প্রকাশ করব আমি। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের বই দিয়েই যাত্রা, তাই সবাই মিলে প্রকাশনীর নাম দিলেন মুক্তধারা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই প্রকাশিত হলো ৩২টি বই।

স্বাধীনতার পরপর সৃজনশীল বই প্রকাশে মুক্তধারা যে বিপ্লব ঘটায় তা তো পাঠক মাত্রই জানে। এসবের পেছনে একমাত্র কারিগর ছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের দিগন্ত উন্মোচিত হয় তার হাতে। নবীন লেখকদের উৎসাহিত করতে ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিয়ে তাদের ভালো পাণ্ডুলিপি নিয়ে বই প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রবর্তন করেছেন মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার। চিত্তরঞ্জন সাহা বই ব্যবসায়ীর চেয়েও ছিলেন বড়ো সংগঠক। একটা বারোয়ারি মেলাকে স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে কী করে বইয়ের মেলায় পরিণত করা যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন।

– অমর একুশে গ্রন্থমেলার নেপথ্য জন নাকি আপনিও?

– সম্ভবত ১৯৭২ সাল হবে। বাংলা একাডেমি চত্বরে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বারোয়ারি মেলা বসে। ভাবলাম ভাষার জন্যই তো এ দিবস। আর সেই দিবসকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি; যার আঙিনায় শহিদ দিবসে বসে মেলা। আমার মনে হলো এখানে বইয়ের দোকান থাকবে না কেন? যেই ভাবা সেই কাজ। একাডেমির আম গাছতলায় ছালার চট বিছিয়ে বই নিয়ে বসে গেলাম। সেই হলো শুরু। এরপর থেকে এই মেলা সম্পূর্ণরূপে বইমেলায় পূর্ণতা পায়।

১৯৫০ সালে প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা উচ্চ শিক্ষিতা বিজলী প্রভাকে বিবাহ করলেও তাদের নিজস্ব কোনো সন্তান ছিল না। পালিত কন্যা চামেলীকে বিবাহ দিয়েছেন।

'১৯৭৭ সালের তিনটে মাস ছিল আমার জীবনের ভয়ংকর দিন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনার জন্য সে সময় রাষ্ট্রীয় বাধা আসে তীব্রভাবে। দুজন বেড়াতে বের হয়েছি গাড়ি করে। হঠাৎ সাদা পোশাক পরা কিছু লোক জিপ থেকে নেমে আসে। আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান। গাড়িতে আরও বসা ছিল বিজলী প্রভা। তুলে নিয়ে যায় অজ্ঞাত স্থানে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল মুক্তধারার স্বজন। তার সহায়তায় বের হয়ে আসি। এরপর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

রোগকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি তিনি। চিরতরুণের মতো পথ চলেছেন; সৃজনী কাজ করে গেছেন। ১৯৮১ সালে গঠন করলেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক তিনি। পরে দায়িত্ব পালন করেন সমিতির সহসভাপতি হিসেবে। সমিতির সাধারণ সভায় সারা দেশ থেকে সদস্যরা ঢাকায় আসতেন। চিত্তবাবু তাদের বাসায় নিয়ে ডাল-ভাত মানে সবজি, মাছসহ নানা পদে আপ্যায়ন করাতেন।

বাঙালি প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার সাক্ষাৎকারভিত্তিক দীর্ঘতম লেখা দেখে সম্পাদক কবিদ্বয়ের চোখ তো চড়ক গাছ! দুজনেই বললেন লেখাটি অনেক ছোটো করে নিয়ে আসতে। মাস্টার্স পরীক্ষার ব্যস্ততা আর আলস্যে লেখার পরিধি সংক্ষিপ্তকরণ আমার আর সম্ভব হয়নি। লেখাটি তাই অপ্রকাশিত থেকে যায়। চিত্তরঞ্জন সাহার মতো দেশপ্রেমিক এমন একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাহসী পুরুষের কথাগুচ্ছ অব্যক্ত রাখি কী করে? ১৭ বছর আগে অর্থাৎ ২০০৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রয়াত হলেন তিনি। আস্তে আস্তে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রবর্তক প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার মুক্তধারাও!

প্রণব মজুমদার: কথাসাহিত্যিক, কবি ও প্রাবন্ধিক

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

ভাষা নিয়ে কথা

মুস্তাফা মাসুদ

ভাষা হলো মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। আমাদের ভাবনাচিন্তা, আনন্দ-বেদনা আর প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ সাধারণত ভাষাকে আশ্রয় করেই সোচ্চার হয়; রচিত হয় প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, নাটক, ছড়া-কবিতা, গান ইত্যাদি। ভাষার বাহন হলো বর্ণ বা বর্ণমালা। অবশ্য শিল্পীর আঁকা ছবিরও এক ধরনের ভাষা থাকে; তবে সে-ভাষা বিমূর্ত। অনেক ক্ষেত্রে ছবির ভাষাও সহজবোধ্য, তা মূর্ত হয় এবং আমাদের চেতনায় নাড়া দেয়। তো, সে-কথা থাক। আমরা এখানে মানুষের লেখার ভাষা এবং মুখের ভাষা নিয়ে কিছু কথা বলব।

মানুষ কথাবলা ও লেখার মাধ্যমে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে; আর ভাষার বেঁচে থাকার অর্থ মানুষের ভাবনাচিন্তা-অনুভূতির বেঁচে থাকা। মানুষের জ্ঞান-মনীষা এবং মানসিক উৎকর্ষের ছাপ থাকে ভাষায় লেখা বই, দলিলপত্র ইত্যাদির বুকে। এ হিসেবে ভাষা হলো সভ্যতার বাহন। সুতরাং ভাষার চর্চা যতবেশি হবে; বুদ্ধিদীপ্ত আরও সচলভাবে হবে, ততোই ভাষার মহিমা বাড়বে। ব্যাপক মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে ভাষার বেঁচে থাকা নির্ভর করে সেই ভাষার অব্যাহত ও মানসম্মত চর্চার ওপর। চর্চা এবং চর্চাকারী ছাড়া ভাষা হারিয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় ভাষার মৃত্যু। যথাযথ চর্চা ও চর্চাকারীর অভাবে পৃথিবীর অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে বা মৃত্যুবরণ করেছে। এক তথ্যে জানা যায়, গত শতাব্দীতে সারা পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০ ভাষা হারিয়ে গেছে; অর্থাৎ প্রতি তিন মাসে প্রায় একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে। পৃথিবীতে বর্তমানে যে সাড়ে ছয় হাজার ভাষা চালু রয়েছে, চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ তার নব্বই শতাংশই বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর আশঙ্কা। এখানে একটি মজার তথ্য হলো, পৃথিবীর বিখ্যাত দশটি ভাষায় সারা বিশ্বের অর্ধেক মানুষ কথা বলে; অবশিষ্ট ৬ হাজার ৪৯০টি ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর বাকি অর্ধেক মানুষ। সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে বিশ্বের এমন দশটি ভাষা হলো: ১. চায়না ম্যান্ডারিন, ২. স্প্যানিশ, ৩. ইংরেজি, ৪. হিন্দি/উর্দু, ৫. আরবি, ৬. পর্তুগিজ, ৭. বাংলা, ৮. রুশ, ৯. জাপানি, ১০. পাঞ্জাবি। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অবস্থান সাত নম্বরে। সারা বিশ্বে কমপক্ষে ১০০টি ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা হাতেগোনা– জাপানের আইনু থেকে চিলির ইয়াগান পর্যন্ত একই অবস্থা। এসব ভাষাভাষী লোকেদের খুঁজে বের করাও মুশকিল। এ ধরনের কয়েকটি বিখ্যাত ঘটনা আছে, তারমধ্যে একটি হচ্ছে: ম্যারি স্মিথ জোনস নাম্নী এক নারী ২০০৮ সালে আলাস্কায় মারা যান এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার মাতৃভাষা ইয়াক ভাষারও মৃত্যু ঘটে; অর্থাৎ তিনি ছাড়া এই ভাষাজানা বা এই ভাষায় কথা বলা মানুষ আর কেউ না থাকায় ভাষাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনটি অন্যত্রও ঘটছে; অহরহ। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, বিশ্বের এক বিরাট সংখ্যক ভাষার চর্চাকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, যা ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আশঙ্কাজনক। আর ভাষার বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার অর্থ মানুষের চিন্তাভাবনা ও মনীষা বৈচিত্র্যহীন এবং সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া; তারপর আস্তে আস্তে হারিয়ে যাওয়া, যেমনটি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'যে নদী হারায়ে স্রোত, চলিতে না পারে/ অসংখ্য শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।' চর্চার অভাবে ভাষারও ঠিক একই অবস্থা হয়– বিস্মৃতির শৈবালের নীচে চাপা পড়ে যায় এবং বিলুপ্ত হয়। অন্যদিকে পুনঃচর্চার মাধ্যমে মৃতপ্রায় ভাষাকে বাঁচিয়ে তোলাও যায়; যেমন– উত্তর আমেরিকার পূর্ব-বলয়ের চেরোকি আদিবাসীদের মাতৃভাষা– চেরোকি ভাষা। উৎসাহী এবং মাতৃভাষা-অনুরাগী টম বোল্ট-এর উদ্যোগ এবং আদিবাসী কিছু মানুষের চেষ্টায় এই ভাষা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই ভাষায় আলাদা পাঠ্যপুস্তক আছে, স্কুল আছে; এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এই ভাষার কোর্স চালু করা হয়েছে।

আধুনিককালে অনেক মানুষ বিদেশে চাকরি লাভের আশায় ইংরেজি, ফ্রেন্স, জার্মান ইত্যাদি ভাষার চর্চা বেশি করে। ফলে তার নিজের মাতৃভাষা অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়; সে ভাষার চর্চা কমে যায়। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটি বেশি ঘটে। মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক না থাকার কারণেও অনেক আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের ভাষাচর্চা ব্যহত হয়। চর্চার অভাবে কিংবা চর্চাস্বল্পতার কারণে পৃথিবীজুড়ে ভাষার মৃত্যু ঘটছে। ইউনেস্কোর বিপদাপন্ন ভাষাসমূহের সারণি-তে ৫৭৬টি ভাষাকে গুরুতর বিপদাপন্ন ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; সেইসাথে হাজারেরও বেশি ভাষাকে সঙ্কটাপন্ন বা হুমকিগ্রস্ত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ধরনের বেশি ঘটনা ঘটেছে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্টিক বিভাগের প্রফেসর পিটার অস্টিন বলেন: 'আমি বলব, বাস্তবিক পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সব (সংখ্যালঘু) ভাষাই বিপদাপন্ন। এমনকি হাজার হাজার মানুষের ব্যবহৃত নাভাজো'র মতো ভাষাও এই শ্রেণিতে পড়ছে; কারণ খুব অল্পসংখক শিশুই

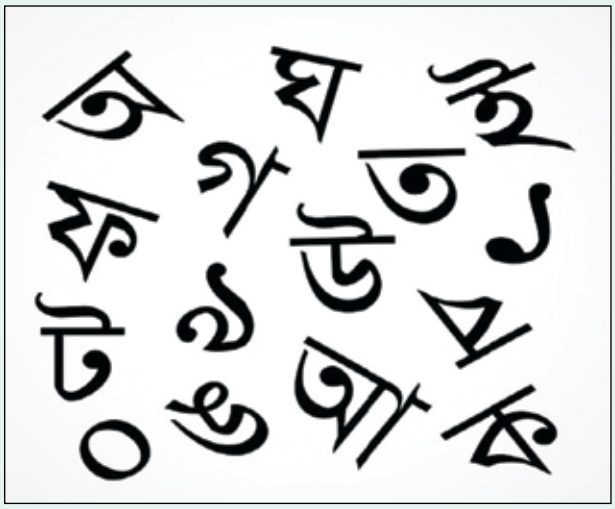

এই ভাষা শিখছে।' এ থেকে বোঝা যায়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা ব্যাপকতর না হলে আজকের চালু ভাষাও অদূর-ভবিষ্যতে মৃত বা বিলুপ্ত ভাষার খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হবে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ভাষাভাষীর সংখ্যার হিসাবে এর অবস্থান বিশ্বে সপ্তম। এই ভাষারই জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছি; আমাদের ভাষা শহিদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষার জন্য বাঙালিরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল বলে ভাষার মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছিল। আমাদের জন্য এটা শোকের ঘটনা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে বীরত্ব ও গর্বের ইতিহাস। রক্তস্নাত আমাদের সেই একুশে ফেব্রুয়ারি এখন জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই ঘোষণা সব দেশের মাতৃভাষার জন্য এক ইতিবাচক ফল নিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চায় নতুন করে প্রেরণা লাভ করে। এই প্রেরণাই মাতৃভাষার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মমতাকে আরও শানিত করে। আরও বেগবান করে। এর ফলে ভাষার চর্চা বাড়ে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মদান বিশ্বের সব ভাষাভাষী মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস। এ থেকে তারা শক্তি পায়– কীভাবে মাতৃভাষার মান রাখতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিতে হয়। সেদিন যদি আমাদের ভাষা-সংগ্রাম ব্যর্থ হতো, তাহলে ভিন জাতির ভাষা উর্দু এসে আমাদের ওপর চেপে বসত। উর্দুই হতো আমাদের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসনে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার অবস্থা তখন কী হতো, তা কি ভাবা যায়? বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব তখন অবহেলিত হতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং সরকারের একপেশে ও বৈরী নীতির কারণে। কিন্তু ভাষার সংগ্রাম বাংলাবিরোধীদের উদ্দেশ্য সেদিন ব্যর্থ করে দিয়েছিল; তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিল– বাংলা আর বাঙালি এক শক্তিমান বারুদঘর; উলটোপালটা করলেই মহাবিস্ফোরণে তছনছ করে দেবে পাকিস্তানের বালির বাঁধ। হয়েছিলও তাই। বাঙালির ভাষা-আন্দোলন এবং ভাষার জন্য আত্মদান এক অজেয় শক্তির উৎস হিসেবে বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতার পথে হাঁটতে সাহায্য করেছে। আর মহান স্বাধীনতা মাতৃভাষা বাংলাকে দিয়েছে অশেষ ঐশ্বর্য আর বৈচিত্র্য। আজ আমরা স্বাধীন জাতি। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। আমাদের সাহিত্য, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বাংলা ভাষার মায়াতেই লালিত ও পালিত। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত মহান ফেব্রুয়ারি মাসে তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মৃতিধন্য মাসে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের মহান ভাষা শহিদদের, ভাষা-সংগ্রামীদের, যাদের জীবন আর কষ্ট-ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা পেয়েছিল হায়েনাদের নখরদংশন থেকে। সেইসঙ্গে আমরা আরও স্মরণ করি আসামের শিলচরে ১৯শে মে ১৯৬১-এ শহিদ ৯ ভাষাবীরকে এবং হাজার হাজার ভাষাসংগ্রামীকে, যারা বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পুলিশের হামলার শিকার হয়েছিলেন। তারাও আমাদের ভাই; ভাষার সংগ্রামে আমাদের ও তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন।

তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই শুভলগ্নে আমাদের শপথ হবে– বাংলা ভাষাকে আমরা ভালোবাসব, ব্যাপকভাবে তার চর্চা করব। কোনো বিরুদ্ধস্রোত কিংবা বৈরী ঝোড়ো হাওয়া যাতে আমাদের ভাষা-সংস্কৃতির কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকব। একইসঙ্গে আমরা আশা করব, বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজ নিজ মাতৃভাষার, সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপকতর করবে; যাতে সেসব ভাষা বিলুপ্ত হয়ে না যায়।

মুস্তাফা মাসুদ: প্রাবন্ধিক, গল্পকার, অনুবাদক ও শিশুসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ডিএমপিতে স্থাপিত হলো 'মুজিব কর্নার'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর স্মৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) সদর দফতরে স্থাপিত হলো 'মুজিব কর্নার'। ১০ই জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এই 'মুজিব কর্নার' উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, মনে পড়ে সেই ৭ই মার্চের ভাষণ। মার্চের প্রত্যেকটা দিনের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাটি জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশকে ঘুরে দাঁড় করিয়েছিলেন, যখন ব্রিজ, কালভার্ট ও রাস্তাঘাটগুলো মেরামত হলো। একটা ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার যখন বাংলাদেশে প্রাণের সঞ্চার হলো তখন তাঁকে প্রাণ হারাতে হলো। স্বাধীনতা বিরোধীদের পরামর্শে কিছু বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সেনা সদস্য এ ঘটনা ঘটিয়েছিল।

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন, আজ ঐতিহাসিক ১০ই জানুয়ারি। আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ডিএমপিতে সুন্দর এক কর্নার করা হয়েছে, এটা খুবই সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

ঋতুরাজ:
আজি এ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

ফাহমিদা শারমীন হক

আহা আজি এ বসন্তে
এত ফুল ফোটে
এত বাঁশি বাজে
এত পাখি গায়।

কবির ছন্দ ও শিল্পীর সুর, প্রকৃতি আর মানুষের হৃদয় উদ্বেল করে বছরের একটি সময় বাংলা আর বাঙালির মনে ও প্রাণে ধ্বনিত হয়– 'আজি এ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। হ্যাঁ, বাংলাদেশ এখন ঋতুরাজ বসন্তের স্পর্শে।

শীতের রুক্ষ, হিমেল দিনের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃতিতে এসেছে বসন্ত। বসন্ত ঋতুরাজ কেন? বাংলা দিনপঞ্জিকায় বারো মাসের ষড়ঋতু। একটু একটু করে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, কেন বসন্তকাল আসে রাজার বেশে; কালবোশেখি কাঁদায় শেষে; বর্ষায় যায় ভেসে ভেসে। গাছে গাছে নতুন পাতা আর ফুলে-ফলে বসন্তকে করে তোলে বিশেষ কিছু– ফুলে ফলে ঢলে ঢলে বহে নিরালায়। এত রূপ, রস আর লাবণ্য নিয়ে প্রকৃতিতে আর কোনো ঋতু হাজির হয় না।

বসন্ত ঋতু শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে রূপান্তর ঘটায়। দিন দীর্ঘ হয় আর রাত ছোটো। তাপমাত্রা হালকা, ফুল ফোটে অজস্র উঠানে-বাগানে, বনে-বাঁদাড়ে, ছাদে-বারান্দায়। মৃদুমন্দ বাতাসে উষ্ণতার ছোঁয়ায় যেন সহনীয় ও বরণীয়, ফাল্গুনী হাওয়ায়। চৈত্রে গিয়ে গ্রীষ্মকে আলিঙ্গন করে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিলে মিলে যায়। কখনও কখনও মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এ বাংলায় বসন্তের আবহটা কেমন? শরৎ সবসময় আসে গ্রীষ্ম, বর্ষার পরে– তাপমাত্রা ধীরে হ্রাস পায়। অন্যদিকে বসন্তে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। 'ভার্নাল ইকুইনক্স' বা মহাবিষুবীয় ক্রান্তিকাল।

অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আধার বসন্তের প্রকৃতি। ফাল্গুনের মোহনীয় রূপ প্রকৃতিতে লাগে আনন্দের ছন্দহিন্দোল। যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, কচি-কাঁচা সবাই যেন চিরযুবা। জীর্ণতা, শীর্ণতা আর জরাকে ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণচাঞ্চল্য ছড়িয়ে দেয় প্রকৃতির মাঝে।

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরাপাতা
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।

গাছের শাখাপ্রশাখায় নতুন পাতার সম্ভার প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে সবুজের কারুকার্যে। শিমুল, জারুল, অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুলের সমারোহ আর কোকিলের গান– আহা, প্রকৃতি যেন নতুন প্রাণস্পর্শে জেগে ওঠে। নবীন ঐশ্বর্যে সেজে ওঠে। বসন্তের প্রকৃতি নান্দনিক ছোঁয়া জাগায় স্বপ্নের মতো। চিত্ত হয় আনন্দে ভরপুর।

এ সময় বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনও মুখরিত হয়ে ওঠে। উদ্‌যাপিত হয় বাসন্তী উৎসব, পিঠা উৎসব, হোলি উৎসব, পূর্ণিমা তিথি, নানা ধরনের মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, হালে মিলনমেলা, কার্নিভাল, বাণিজ্যমেলা, বইমেলা, শিল্পমেলা, বিজ্ঞানমেলা আরও কত কী! আর খেলাধুলা তো ধানক্ষেতে, রাস্তায়, মেঠো পথে, উঠানে-মাঠে-ঘাটে। সবাই নেয় মাথা পেতে। তারুণ্য যেন বসন্তের সাথে একাকার।

একালে শহর-মহানগরের যান্ত্রিক জীবনেও একটি প্রাণোচ্ছল আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে বসন্ত। চারুকলার বকুলতলায়, রমনার বটমূলে, রাসেল স্কয়ারে, হাকিম তলায়, আবার কোথাও এ মোড়ে ঐ মোড়ে গান, আবৃত্তি, নাটক, আলোচনার মাধ্যমে মহাসমারোহে বসন্ত বরণ উৎসব পালন করা হয়। এত এত টেলিভিশন, রেডিও যেন সব জনমানুষের কাছে এসব প্রচার করে ক্ষান্ত হয় না। নিজস্ব আয়োজনেও নানা আঙ্গিকে, নানা বর্ণে অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করে বসন্ত আর বাংলা সংস্কৃতিতে একাকার করে জনমানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আসলে বনে বনে যে রং, যে সুর ও প্রাণের যে উচ্ছ্বাস বসন্ত ছড়িয়ে দেয়, তা কবিচিত্তে, গীতি, নৃত্যে বৃত্তে বৃত্তে ছড়িয়ে পড়ে। নির্মল মেঘশূন্য আকাশের তলায় গলা ছেড়ে গান গেয়ে গরুর পাল নিয়ে যায় রাখাল মাঠে, ঘাটে। চাষি ইরি-বোরো ধানে থাকে মাতোয়ারা। পল্লি আর শহর-মহানগর কোনোটাই বসন্তকে আড়াল করতে পারে না। বসন্তও যেন রঙে-রূপে-রসে ঝলমল করে ওঠে। উদাসী করে তোলে। বসন্ত যখন জাগ্রত দ্বারে– সব অর্থে এত সব উৎসবে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকষ্ট ভুলে মিলেমিশে যায় রঙে-আনন্দে।

দক্ষিণা মলয়, আম্রমুকুল তার পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি মনে দেয় শান্তির পরশ– তাই বসন্তকে ভালো না লেগে উপায় নেই। যে আম্র বৃক্ষ বড়ো বড়ো পাতা শোভিত হয়ে সারা বছর দাঁড়িয়ে আছে– সেখানে মৌমাছির আনাগোনা, মধু সংগ্রহের কাব্য আমাদের হৃদয়ে মধুর স্বপ্ন নিয়ে আসে।

হিমালয়ের পাদদেশে পৃথিবীর অন্যতম এ বৃহৎ বদ্বীপ বাংলাদেশের জলবায়ুর আর কালের হিসাবে বছরের শেষ ঋতু বসন্ত। এ যেন ক্রান্তিকাল নিজস্ব ক্লান্তিকে দূরে ঠেলে চৈত্র সংক্রান্তিতে নববর্ষে পদার্পণ করে। এ সময় বাঙালির আনন্দঘন দিন হলেও বায়ু নির্মল নয়, ধূলাবালি আর রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব সর্বত্র। ফ্লু আর মহামারির আশঙ্কা থাকে গ্রামীণ ও শহুরে জনপদে। মাস্ক ব্যবহার আর সতর্কতার বিকল্প নেই। প্রকৃতি, পাখপাখালি আর কৃষ্টি-সংস্কৃতির আনন্দের সাথে জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শিশু, ছেলেমেয়েদের প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ঋতুরাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশে প্রতিভাত হয়ে থাকে–

- মাঘের শীতের ক্রান্তিকালে বসন্তের যাত্রা শুরু, আর বোশেখের তাপদাহের মাঝের সময় বসন্ত ফল্গুধারা।
- ফাল্গুন আর চৈত্র মাসের সমন্বয়ে ঋতুচক্রের ছয়টি ঋতুর মধ্যে শেষ ঋতুটি বসন্ত।
- বসন্তের আগমনে চারদিকে খুশির বার্তা বেজে ওঠে, প্রকৃতির রাজ্যে বুড়ো শীত বিদায় নিয়ে ঋতুরাজের আবির্ভাব ঘটে।
- শীতে যেসব বৃক্ষে পাতা ঝরে পড়ে, সেসব বৃক্ষে নতুন করে পাতা জন্মায় বসন্ত এলে।
- বসন্তকালের পরিষ্কার ঝকমকে সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যার প্রকৃতিরাজ্যে এক মোহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে।
- শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের সবুজ শাখায় লাল ফুলে শোভিত হয়। আম্রকাননে মুকুল বিকশিত হয়। চারদিকে কুহু কুহু ডাকে কোকিলের আনাগোনায় মুখরিত হয়।
- বসন্তে বাঙালির জীবনে আসে আনন্দের দোল। মানুষের শরীর ও মন এ অনাবিল খুশিতে ভরে ওঠে। বইমেলা, আনন্দমেলা, বাণিজ্যমেলা, জনপদের হরেকমেলা, পিঠা উৎসব, বসন্ত বরণ, চারদিকে খেলাধুলা–এ যেন আনন্দঘন বাংলার জনপদ।
- উত্তরের শীতল বাতাস বন্ধ হয়ে দক্ষিণে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে থাকে।
- এ সময় বিভিন্ন ফ্লু ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।
- ঋতুরাজ বসন্ত যাবার আগেও দু'হাত ভরে দিয়ে যায় নতুন একটি বছর– বৈশাখের আনন্দে বাঙালিকে মাতিয়ে দেয় নবযাত্রায়।

শীতকালে প্রকৃতি থেকে যে পাতা ঝরে পড়ে, বসন্ত এলে সে পাতা নতুন আলোকবর্তিকা নিয়ে জন্মায় ডালে ডালে, দখিনা বাতাসে ঝিরঝির বইতে থাকে। তাই বসন্তকাল মানুষের মনে চেতনা আনে, প্রাকৃতিকভাবে মনকে প্রভাবিত করে, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। বসন্তের আগমনে খুশির স্পর্শ অনুভূত হয়। বসন্ত তুমি রাজার বেশে আজি জাগ্রত দ্বারে। বসন্তের সৌরভ ছুঁয়ে যাক সবখানে-সবপ্রাণে।

ফাহমিদা শারমীন হক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

মৎস্য উৎপাদনে দিনাজপুর জেলা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ

মৎস্য উৎপাদনে দিনাজপুর জেলা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে এ জেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ৩৯৬ মেট্রিক টন।

দিনাজপুর জেলা মৎস্য অফিসের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে এ জেলায় মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ২০০৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১০৩ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে মোট ৫ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্তকরণ, গত বছর ৭টি অভয়াশ্রম ও ১৩টি বিল নার্সারি স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়া মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে গত বছরে ৫টি এয়ারেটর ও সেচপাম্প মৎস্যচাষিদের মাঝে বিতরণ এবং মৎস্যচাষিদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৪০ জন মৎস্যচাষির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দিনাজপুর জেলায় মোট ৫৩ হাজার ৮৭৫টি পুকুর রয়েছে। বর্তমানে চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। এছাড়া স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনেও বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

[সূত্র: তথ্য অধিদফতরের ৩০শে জানুয়ারির ২৬৩৭ নম্বর তথ্যবিবরণী]

প্রতিবেদন : জে আর পঙ্কজ

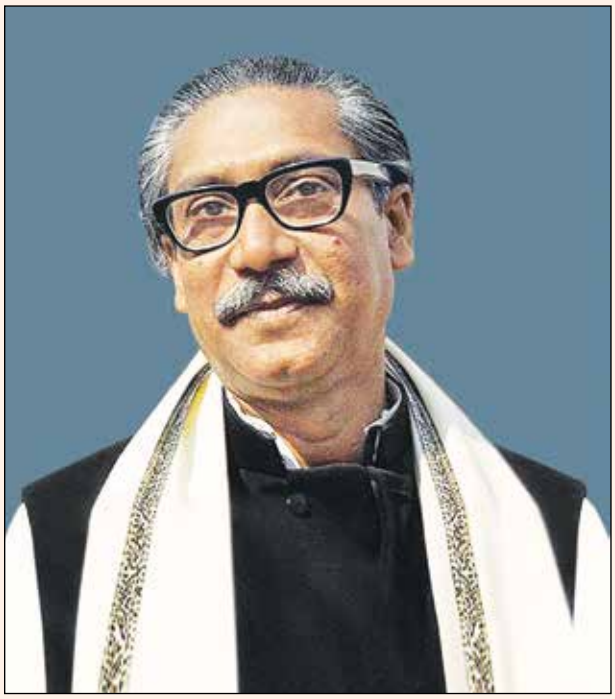

বাংলা, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু

শহিদুল ইসলাম

সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি ভারতীয় উপমহাদেশ– পৃথিবীর মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে বিভক্ত জাতি শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। প্রাচীন বাংলার শাসন আমলকে বিভিন্ন যুগে করা যায়। যথা– গুপ্তপূর্ব যুগ, গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, চন্দ্র, বর্মণ ও সেন যুগ এবং পরবর্তীতে মুসলিম শাসন এবং ইংরেজ শাসন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য সৌন্দর্য এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডার ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইতিহাস-ঐতিহ্য সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে ১২০৩ সাল থেকে শুরু করতে হয়। ১২০৩ সালে বখতিয়ার খলজি ১৭ জন অশ্বআরোহী সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৫৫০ বছর চলল মুসলিম শাসন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু জমিদারের ষড়যন্ত্র, মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হলো বাংলার স্বাধীনতা সূর্য। জেঁকে বসলো সাত সমুদ্র তেরো নদী ওপারের শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান ইংরেজ। ইংরেজরা শাসনের নামে শোষণ এবং অত্যাচার শুরু করল নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং ব্রিটিশরা তাদের কথা বলার জন্য অবশেষে ১৮৮৫ সালে সর্বদলীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সর্বদলীয় কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থ বেশি করে দেখার জন্য মুসলমানদের ভেতর দ্বিমত পোষণ শুরু হলো। মুসলমানরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলো। ব্রিটিশদের অত্যাচার এবং জুলুম চরমে ওঠায় গোড়া থেকে ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ শুরু হয়। ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, রংপুর কৃষক বিদ্রোহ, বাল্মীকি সাহের বিদ্রোহ, পাগলাপন্থি বিদ্রোহ প্রভৃতি। পরবর্তীতে বিভিন্ন মনীষী সংস্কার আন্দোলন এবং বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, তিতুমীর, আব্দুল লতিফ অন্যতম। পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধিকার আন্দোলন সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব প্রাতঃস্মরণীয়। বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয় গঠিত হলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হন।

বঙ্গবন্ধু জাতির বৃহৎ স্বার্থে আন্দোলন করেছেন এবং বার বার তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। কারাগার থেকেই তাঁর দিক নির্দেশনায় আন্দোলন জোরদার হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদরা। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই রক্তমাখা গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা দাঁড়িয়ে আজ বিশেষ ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত। ২১শে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারা বিশ্বের সকল নাগরিকের ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কারিগর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে শোকাভিভূত বাংলায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৪১ সালের ১২ই আগস্ট বঙ্গীয় আইনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ইংরেজিতে একটা ভাষণ প্রদান করেন– যা বাঙালি জাতির একটি ঐতিহাসিক দলিল। ভাষণটির বাংলা ভাবার্থ– 'একজন বাঙালি হিসেবে এবং রবীন্দ্রনাথ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বাংলার একজন বাসিন্দা হিসেবে আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে– পৃথিবীর সকল ভাষা ও সাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যের জন্য যিনি সর্বোচ্চ সম্মান ছিনিয়ে এনেছিলেন সেই মহান পুরুষটি আর আমাদের সাথে নেই। এ দেশের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে কাব্যগ্রন্থ, বইপুস্তকের মধ্যেই নয় বরং দেশের কোটি কোটি মানুষের অন্তরে তার মহান অবদান ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আমার এই সামান্য কটি কথার মধ্য দিয়ে তাঁর তিরোধানে আমাদের মনের হৃদয়ের গভীর কোণে প্রকাশ করছি। কোনো একটি সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে নয় বরং মহান বাঙালি জাতির (great bangalee race) সদস্য হিসেবেই আমরা বাঙালিরা এ জন্য গর্বিত যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোক, যে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে গোটা বিশ্বের সংস্কৃতিবান মানবগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়েছে।'[১] বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মানার্থে যুক্ত বাংলায় প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলেন, বাঙালি জাতির নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানার্থেও তা সমভাবেই গ্রহণযোগ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরস্মরণীয়। তিনি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিতি করেছেন। তদ্রূপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার এবং আপোশহীন সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিকে প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থপতি হয়েছেন। তার জন্য তিনিও স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁরা দুইজনই বাঙালি জাতির গর্বের ধন।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিশ্বের অপর প্রান্তের আরেক অবিসংবাদিত নেতার সাথে সাক্ষাতে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখেনি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় এই মানুষটি হিমালয় সম।'[২]

বিখ্যাত সাংবাদিক সিরিলডান একবার বলেছিলেন, 'In The Thousand year history of Bangladesh, Sheikh Mujib is the only leader who has, in terms of blood, race, language, culture and birth, been a full-blooded Bengali. His physical stature was immense. His voice was redolent of thunder. His charisma worked magic on people. The courage and charm that flowed from him made him a unique superman in these times.'[৩] সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী গত ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী স্মরণসভায় যথার্থই বলেছেন, 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা জাতিকে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা বাঙালি জাতিকে মাথা উঁচু করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁদের আদর্শের পতাকা বহন করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে মর্মবাণী– বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন তাই আমাদের পথ দেখাবে। এই মর্মবাণীকে সম্বল করে যদি আমরা পথ চলতে পারি তাহলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।[৪] ১৯৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহান একুশে উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আট দিনব্যাপী প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিল বাংলা একাডেমি। এ জাতীয় ব্যাপক সাহিত্য সম্মেলন গত ২৬ বছরে একবারও এদেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বের ছয়টি দেশের অর্ধশতাধিক শিল্পী ও সাহিত্যিক এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করায় সম্মেলন আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার প্রায় অর্ধসহস্রাধিক কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির উদ্বোধনী বক্তব্যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আমার দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সেবীরা এই প্রথম একটি জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। এই মহতী প্রচেষ্টা যে খুব সময়োপযোগী হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘদিনব্যাপী নানা শোষণ ও বঞ্চনার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ আমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধার্থ ও নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আজও আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে এবং দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত রয়েছি। কিন্তু আমরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দরিদ্র নই। আমাদের ভাষার দু'হাজার বছরের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আজকে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'[৫] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, 'আমরা জানি আমাদের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মী, মেহনতি মানুষ-কৃষক-শ্রমিক এবং ছাত্র-তরুণদের পাশাপাশি দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি সেবীরাও সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, রক্ত দিয়েছেন। বিশ্বের স্বাধীনতালব্ধ জাতিগুলোর মধ্যে আমরা এদিক থেকে গর্ব করতে পারি যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম হাতে হাত ধরে অগ্রসর হয়েছে। আজকে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতি সেবীদের কাছে আমার প্রত্যাশা আরও অধিক। যারা সাহিত্য সাধনা করছেন, শিল্পের চর্চা করছেন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সেবা করছেন তাদেরকে দেশের জনগণের সাথে গভীর যোগসূত্র রক্ষা করে অগ্রসর হতে হবে। দেশের জনগণকে চিন্তাভাবনা, আনন্দ-বেদনা এবং সামগ্রিক অর্থে তাদের জীবন প্রবাহ আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে অবশ্যই ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্য-শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে এ দেশের দুঃখ, মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা। সাহিত্য-শিল্পকে কাজে লাগাতে হবে তাদের কল্যাণে। আজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে আমাদের লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ খুলে ধরুন। দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে সরকারকে সাহায্য করুন। আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন মহৎ সাহিত্যে উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারা জীবন জনগণকে সাথে নিয়েই সংগ্রাম করেছি, এখনো করছি। ভবিষ্যতে যা কিছু করব, জনগণকে নিয়েই করব। সুধী বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি যেন শুধু সাহেবের পাকা দালানেই আবদ্ধ না হয়ে থাকে, বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যেন তাতে প্রতিফলিত হয়। আজকের সাহিত্য সম্মেলনে যদি এ সবের মূল্যায়ন হয়, তবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব।'[৬] তিনি আরও বলেন, 'যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে আজ সমস্যার অন্ত নেই। আমাদের আর্থিক অভাব অনটন আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুঃসহ অভাব আছে কিন্তু আমি মনে করি সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের মূল্যবোধের অভাবই আজ সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এই অভাব জাতীয় যে সংকটের সৃষ্টি করেছে তা অবিলম্বে রোধ করা দরকার। আমি বিশ্বাস করি দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী সংস্কৃতি সেবা শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীরা এই মঙ্গল উত্তরণে এবং জাতীয় মূল্যবোধের উজ্জীবনে ও সুকুমার বৃত্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আজকে সময় এসেছে যখন প্রত্যেককে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, নিজের নিজের ক্ষেত্রে তারা দেশের কল্যাণে সেই দায়িত্ব ও ভূমিকা কতটা আন্তরিকভাবে পালন করছেন। দেশ ও জাতি আজ তাদের জন্য এই দাবি জানায়।'[৭]

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, 'একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্রই একটি কথা বলি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও জাগবে না। এই বাংলার সাথে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। বড়ো চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই সেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব।

মানবতার সুদক্ষ প্রকৌশলী দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। আমি আমার এই সাহিত্যের সম্মেলনে আপনাদেরকে সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।'[৮]

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শোষণ ও বৈষম্যহীন একটি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং আপোশহীন সংগ্রামের কারণে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ প্রদান করেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে প্রথম বিশ্ব সভায় বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত ও মুখ উজ্জ্বল করেছেন বিশ্বের দরবারে। জাতিসংঘের আদর্শ ও বিশ্বশান্তির প্রতি প্রগাঢ় আস্থা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই স্মরণীয় ভাষণে বলেছেন, 'বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরেই নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বাধিকার প্রশ্নে সংগ্রাম করে এসেছে। এ আলাদা জাতি হিসেবে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা তার সংগ্রাম। তারা বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে শান্তিতে বসবাস করতে প্রয়াসী। জাতিসংঘের মহান আর্দশই বাংলাদেশের জনগণের আদর্শ যার জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আমি জানি আমাদের লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মা বিশ্বশান্তির জন্যে বাঙালির প্রচেষ্টাকে অবিচল সমর্থন যুগিয়েছে।'[৯] পারমাণবিক অস্ত্রসহ ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বের জাতিসমূহের হুঁশিয়ারি করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর এ ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'বর্তমান বিশ্ব এক গভীর সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি ও যুদ্ধ আমাদের সকলকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদেরকে বেছে নিতে হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও মানবিক দুর্দশাকে অতিক্রম করে একটি সুন্দর বিশ্ব, না ভয়াবহ অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে একটি আসন্ন যুদ্ধ। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাতে পারি। এ প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ পারমাণবিক সংঘর্ষকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে।'[১০]

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ আস্থা ও সমর্থন স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকার আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বীকৃতি এবং মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।'[১১]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এ ঐতিহাসিক ভাষণটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বস্তুত বঙ্গবন্ধু এ ভাষণ বাংলাদেশের বিদেশনীতির স্থূল ভীতি হিসেবেই পরিগণিত হয়। তাই এ ভাষণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানি আমলে শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিকামী বাঙালি পাগল হয়ে ওঠে তাঁর নেতৃত্বে। অবশেষে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘঠিত হয়। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ও অগণিত মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে অবদান রাখেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা আছে। তাঁর সরকারের সফলতাসমূহ: সংবিধান প্রণয়ন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তন, অস্ত্র সমর্পণ, জাতি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ, জাতীয়করণ নীতির প্রর্বতন, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান, জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাংলাদেশি মুদ্রার প্রচলন, বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ, শিল্প সংস্কার, ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, কমনওয়েলথ জাতিসংঘ, OIC-এর সদস্যপদ লাভ প্রভৃতি। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা দিয়ে তাই লেখাটা শেষ করছি–

জীবনের যত পূজা হল না সারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরনীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।।
জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আসার অনাহত
তোমার বীনাতারে বাজিয়ে তারা–
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।।[১২]

তথ্যসূত্র

১। এম আনিসুজ্জামান, *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ২১;

২। প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, 'বিশ্বপরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধু', *বিজয় সুধা*, বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিশেষ সাময়িকী, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ১১;

৩। প্রাগুক্ত পৃ. ১১;

৪। *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ২২;

৫। মোবারক হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত, *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* ১৯৬৩-১৯৭৬, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ৩০২;

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২;

৭। প্রাগুক্ত ,পৃ. ৩০৩;

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩;

৯। *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ৩৩;

১০। *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ৩৪;

১১। *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ৩৫;

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৮০;

১৩। মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।

শহিদুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক, প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, সরকারি ইস্পাহানী কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, shahidulislamiuc@gmail.com

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় ভাষা শহিদদের অবদান

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের দ্বার উন্মোচিত হয়। এই বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় ভাষা শহিদদের অবদান অনস্বীকার্য। ভাষা শহিদদের অবদান জানার আগে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনার দীর্ঘ ইতিহাসটির কিছু জানা প্রয়োজন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কিছু রাজকর্মচারীর লোভ ও বেইমানির কারণে পরাজিত হয়। মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইংরেজরা এদেশের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেয়। প্রায় দুইশত বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করার পর ব্রিটিশরা চরম আন্দোলনের মুখে এই দেশ ছেড়ে চলে যায়। এর আগে তারা ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইভাগে বিভক্ত করে যায়। পাকিস্তানের ছিল ২টি প্রদেশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এরমধ্যে পূর্ব বাংলাকেই তারা নাম দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। তখন পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৭ কোটির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাই ছিল ৪ কোটি এবং তাদের প্রত্যেকের ভাষাই ছিল বাংলা। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি এবং তারা কথা বলত পাঞ্জাবি, উর্দু, সিন্ধি ও পশতু ভাষায়। তবুও পশ্চিম পাকিস্তানিরাই সমগ্র পাকিস্তান শাসন করত। তারা আমাদের বাঙালির ওপর সর্বদাই অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতো। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হলো উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র প্রধান ভাষা করা হবে। এটি জানতে পেরে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষীরা খুবই হতবাক ও ক্ষুব্ধ হলো। এই নিয়ে শুরু হলো গণ আন্দোলন।

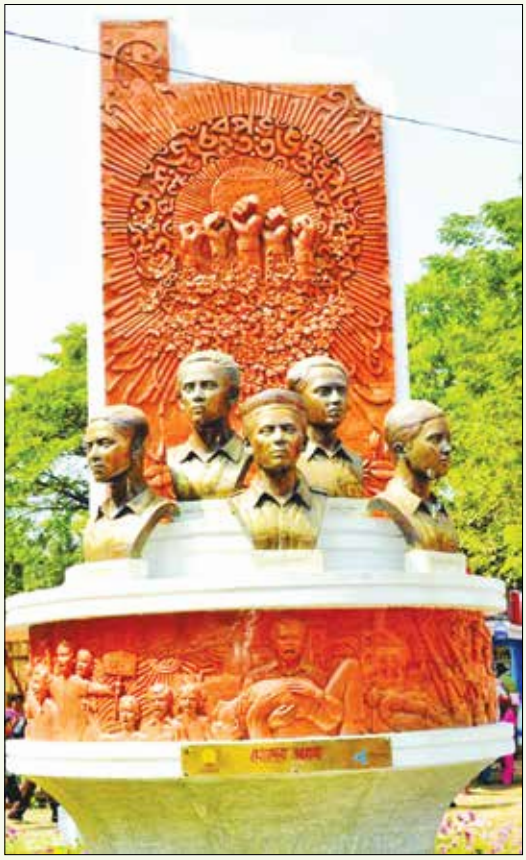

বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আলোচনা চলে। ১৯১৮ সালে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষাকে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯২১ সালে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারের কাছে একই প্রস্তাব রাখেন। ১৯৩৭ সালে *দৈনিক আজাদ* 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের রূপকার প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি হয়।

ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করতে বহু নেতাকর্মী অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বদানকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, আবুল কাশেম, মো. তোয়াহা, গাজীউল হক, শওকত আলী, নাইমুদ্দিন আহমেদ, কমরুদ্দিন আহমেদ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ, গোলাম মাওলাসহ অনেকে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় ১৯৪৮ সাল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সাড়ে চার কোটি বাঙালির প্রথম প্রতিবাদী স্লোগান– 'উর্দু নয়, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

কুমিল্লার গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন। তাঁকে বলা হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম ভাষা সৈনিক। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত আইনসভায় এ দাবি প্রথম উচ্চারিত হয়। তিনি কংগ্রেস-এর আদর্শ ও দর্শনে বিশ্বাসী। আইনসভায় এ দাবির প্রতি সমর্থন জানান কংগ্রেসদলীয় সদস্য গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপোদ কুমার দত্ত, প্রেমহরি বর্মা। একই সালের ২৫শে আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে সব কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উত্থাপন করেন তিনি। এটাই ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার গণআকাঙ্ক্ষার সূচনা। তিন তিনবার বিলটি উত্থাপন করার পরও তা বাতিল করা হয়।

পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে না– এই ঘটনার খবর ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বাঙালি যুবসমাজ বুঝতে পারে যে, বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। এ সময় মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা করার মতো কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের একমাস ২২ দিন আগে ১৯৪৮-এর ৪ঠা জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ আব্দুল আজিজ এ নতুন ছাত্র

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য। শেখ মুজিবুর রহমানের দায়িত্ব বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা আর শেখ আব্দুল আজিজের দায়িত্ব বৃহত্তর খুলনা জেলার ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা।

তখনকার উদীয়মান রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নবগঠিত মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যৌথভাবে ১৯৪৮-এর ২রা মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন এবং পরিষদের সভায় ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ১৭ জেলায় হরতাল আহ্বান করে। পূর্ব পাকিস্তান নামক ভূ-খণ্ডে এই প্রথম হরতাল কর্মসূচি সফল করতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান খুলনায় আসেন। ঐ দিন সারা বাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ও তমদ্দুন মজলিসের প্রধান আবুল কাশেমসহ সংগ্রাম পরিষদের শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন জেলা সফর করে ছাত্র-জনতাকে দাবি আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশ শেষে বের হওয়া মিছিল ১১ই মার্চ সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন কালে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, শওকত আলী, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলন তীব্র হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ততদিনে বাঙালি ছাত্র-যুব-জনতার প্রধান স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

শেখ মুজিব, শামসুল হকসহ নেতাদের ১৫ই মার্চ জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় পাকিস্তানের জনক নামে খ্যাত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসছেন বলে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৭ই মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘটের ঘোষণা দেন শেখ মুজিব। আন্দোলন ঘোরতর হওয়ায় পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ ঢাকায় আসে। রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বলেন, 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর তিনদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও একই ঘোষণা দিলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ছাত্ররা তার সামনেই তীব্র প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, 'না, না, না।' তার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

পূর্ব পাকিস্তানের আপামর ছাত্র-জনতা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একের পর এক প্রতিবাদ সভা করে বাঙালির সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে তোলে। সারা দেশেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ১১ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন। পাকিস্তানি শাসকরা বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিবাদী শত শত ছাত্র-যুবককে গ্রেপ্তার করতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, মহিউদ্দিন আহমেদসহ অনেক ছাত্র-যুব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আন্দোলনের মুখে তাদের মুক্তিও দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার পক্ষে তথ্যপূর্ণ মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত এক নিবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার বিপরীতে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের যদি একটি রাষ্ট্রভাষা হয় তবে গণতন্ত্রসম্মতভাবে শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। যদি একাধিক রাষ্ট্রভাষা হয় তবে উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই বক্তব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখনকার অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার ধারক ও বাহক এবং প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে।

১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৬শে এপ্রিল মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলে এক উপ-নির্বাচনে বিজয় লাভ করেন। শেখ মুজিব তাঁর সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে আবার আটক করা হয়। এ সময় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২৩শে জুন সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন করে শেখ মুজিবকে এই দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্মসচিব নির্ধারিত করা হয়। জুনের শেষ দিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন মুজিব। এ বছরের সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগে তাঁকে সাময়িকভাবে আটক করা হলেও অচিরেই ছাড়া পায়। এরপর ভাসানীর সাথে মিলে লিয়াকত আলী খাঁনের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় ভাসানী ও মুজিবকে আটক করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী এই অবস্থানে দৃঢ় থাকলে ভাষা আন্দোলন অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত। শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। এই সম্পর্কে বলা হয়, সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুসহ ভাষা আন্দোলনকারীরা বেশ অসুবিধায় পড়ে। তাই এ বছর জুন মাসে শেখ মুজিব তাঁর সাথে দেখা করার জন্য করাচি যায়। এবং তাঁর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবি সমর্থনে তাঁকে একটি বক্তব্য দিতে বলেন। শেখ মুজিবের বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ ও অসীম রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে বক্তব্য দেন। ১৯৫২ সালের জুন মাসে *ইত্তেফাকে* তাঁর বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়। মওলানা ভাসানী এ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলা ভাষার পক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে মুজিব সক্ষম না হলে শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। শেখ মুজিবের মতো দূরদর্শী নেতার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। বাংলা ভাষার আন্দোলনের ইতিহাসে শেখ মুজিবের এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। যেমন– আব্দুস সামাদ, অলি আহাদ,

শামসুল হক, আব্দুল মতিন, মো. তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ, জিল্লুর রহমান, আতাউর রহমান খান, কামরুজ্জামান, আব্দুল মুমিন, নইমুদ্দিন আহমদ আলী তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জেলখানা থেকে এবং পরে হাসপাতালে থাকাকালীন আন্দোলন সম্পর্কে চিরকুটের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাতেন।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। এ সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের স্থলে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় জিন্নাহ'র কথারই পুনরুক্তি করে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। নাজিমউদ্দীনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। সেদিন ছাত্রসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়।

শেখ মুজিব যখন কারাগারে তখন ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। মিছিল করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করছিল শত-সহস্র ছাত্র-জনতা। মিছিল শেষে বেলতলায় জমা হয়েছে পরবর্তী ঘোষণার জন্য। শামসুল হক চৌধুরী, গোলাম মাওলা, আব্দুস সামাদ আজাদ- এর মাধ্যমে শেখ মুজিব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি সমর্থন জানিয়েছেন একুশের দেশব্যাপী হরতালের প্রতি। বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভায় সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। আরও একটি খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি এবং মহিউদ্দিন আহমেদ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশন করবেন। এদিকে ভাষা আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে কারাবন্দি ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান অনশন শুরু করেন। তাই ১৮ই ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দেওয়ার কারণে তাঁকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলখানায় সরিয়ে নেওয়া হয়।

ওই আন্দোলন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ও অধিকার আদায়ে সংগঠিত। পাকিস্তান শাসকশ্রেণির অনমনীয় মনোভাব, উর্দুকে তারা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবেই। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ অন্যান্য শীর্ষ পাকিস্তানি নেতারা এ বিষয়ে লৌহকঠিন মনোভাব। তাদের প্রতি অন্ধ সমর্থন জুগিয়েছেন মুসলিম লীগ দলের বাঙালি নেতারা। তারা বাংলার টানে বিপরীত পথে হাঁটলে পদ-প্রাপ্তি হারানোর ভয়। তাই তারা ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছেন।

আদর্শবাদী ছাত্র-যুবকদের ভয় নেই কোনো কিছু হারানোর। আছে শুধু মাতৃভাষার আদর্শের টানে দাবি আদায়ের স্বপ্ন। তাদের স্লোগান, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, সর্বস্তরে বাংলা চাই।' মিছিলে উচ্চারিত হতো এসব কথা। যৌবন বা তারুণ্য এমন একটা বয়স, যখন আদর্শের টানে লড়াইয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে ভয় থাকে না। তাই রক্ত দিয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারিতে।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আগে থেকেই ভাষা আন্দোলনের জন্য ধর্মঘট ও হরতালের কথা আঁচ করতে পেরে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতেই ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। পরদিন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টার মধ্যে ঢাকা শহরের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসে জড়ো হতে লাগল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রায় ১০ হাজার ছাত্র সেখানে জমায়েত হয়। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট সভা। রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার বিষয়ে চূড়ান্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেয় ছাত্রদের হাতে। ছাত্ররাসহ সভার সকলেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সমর্থনে এবং অধিকাংশ বক্তাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় মিছিল করার পক্ষে মত দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন ছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা মিছিল বের করে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে ট্রাকে উঠিয়ে নেয়। ট্রাকেও তারা স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে দু'পক্ষেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিকে মিছিল এগুতে থাকে। পুলিশ ছাত্র-জনতার দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ছাত্ররাও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে দু'ঘন্টা চলতে থাকে। অবিরাম গুলি ছোঁড়ার কারণে প্রথম শহিদ হন মানিকগঞ্জের ছেলে রফিকউদ্দিন আহমেদ। মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র রফিক পড়া শেষ না করেই ঢাকার বাদামতলীতে বাবার ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু ঐ দিন তার মন আটকে থাকেনি ব্যাবসায়। নিজ মাতৃভাষার দাবিতে সেদিন তিনি ছুটে গিয়েছিলেন মিছিলে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানো গ্যাসের কারণে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ব্যারাকে আশ্রয় নেয়, সেখানে রফিকউদ্দিন ছিল। প্রথম গুলিতেই তাঁর মাথার খুলি উড়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান তিনি। প্রথমশ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ওবায়দুল্লাহর উপস্থিতিতে তাঁর জানাজা পড়ান আজিমপুর মসজিদের ইমাম। সংগোপনে আজিমপুর গোরস্থানে অসংরক্ষিত এলাকায় তার মৃতদেহ দাফন করা হয়। এরপর গুলিতে আহত হন ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের ছেলে আব্দুল জব্বার। গরিব ঘরের সন্তান বলে বেশি পড়াশোনা করতে না পেরে বিদেশে চাকরি করতে চলে যান। দেশে ফিরে শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য ঢাকা এসেছিলেন। নিজ মাতৃভাষার জন্য প্রাণ কেঁদেছিল বলেই তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশের গুলি তার শরীরে লাগলে হাসপাতালে নেওয়ার পর সে মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় শহিদ হন তিনি। মুর্শিদাবাদের ছেলে আবুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। ২১শের দিনে হলের সকল ছাত্রদের সঙ্গে মায়ের ভাষার দাবিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে। এক সময় গুলি এসে লাগল তাঁর গায়ে। বন্ধুরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। তিনি তৃতীয় ভাষা শহিদ। আরেক ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম। ফেনী জেলায় তার বাড়ি। তিনি ঢাকায় তখনকার শিল্প ডাইরেক্টরেটে কর্মরত ছিলেন। নিজ মাতৃভাষার টানে তিনিও মিছিলে যোগ দেন। এক সময় পুলিশের গুলি তাঁর শরীরে এসে লাগে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় ২ মাস মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ৭ই এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গুলি চালানোর সংবাদে দলে দলে লোক এসে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হাজির হতে থাকে। চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

শহরের সমস্ত দোকানপাট অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার শুধু ছাত্র নয় সাধারণ জনতা ও চাকরিজীবী সকলেই প্রতিবাদী মিছিল বের করে। প্রথমে ২১ তারিখে নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা শেষে এই মিছিল বের হয়। সেখানেও পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিতে হাইকোর্টে কর্মরত শফিউর রহমানসহ রিক্সাচালক আউয়াল ও কিশোর ওহিউল্লাহ শহিদ হন। এছাড়া নাম না জানা শহরের কোন কোণে, কোন বাসায় সন্তানের অপেক্ষায় তাঁদের মা চাপা কান্নায় জলে বুক ভাসিয়েছেন। তাঁদের অপেক্ষা আমৃত্যু গভীর শোকে যন্ত্রণাদগ্ধ।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন একটি সুনির্দিষ্ট এবং প্রবল চেতনা সৃষ্টিকারী মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এই আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তবে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার পর এই আন্দোলন আরও ঘোরতর হয়। যা ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনটি চরম পরিণতি লাভ করে।

ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার পরও জেল থেকেই নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ সময় তিনি জেলে থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৭ দিন ধরে অনশন করেছিলেন। তিনি কৌশলে জেলে থেকেই আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৩ দিন এই অনশন কার্যকর ছিল, ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাঁকেসহ রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়।

শুরু থেকেই বাঙালি শিক্ষিত নারীরা ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয়। মুসলিম লীগ সরকারের ভীত কাঁপিয়ে তোলে। ঢাকাইয়া অনেক উর্দুভাষী পরিবার তারা পারিবারিকভাবে উর্দু কথা বললেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। শহিদমিনার নির্মাণে সাহসী পুরুষ পেয়ারু সরদার এবং শিল্পী হামিদুর রহমান দু'জনেই উর্দুভাষী পরিবারের লোক। যারা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবন্দি হয়েছেন ঢাকাইয়া সমাজ সেখানেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুরানো ঢাকার অনেক অধিবাসীও আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ঢাকাইয়াদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন ভাষা সৈনিক। ভাষা আন্দোলনে তাদের অনেক অবদান রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সময় পুরানো ঢাকার অলিগলি থেকে সব ইশতাহার ছাপা হয়। ভাষা সৈনিক আহমেদ রফিক এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান সরকার। সরকার বাঙালির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়, বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে লড়তে হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলে ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানের সংবিধান নতুন করে ১৯৫৬ সালে প্রণীত হলে সংবিধানের ২১৪(১) অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে লেখা হয়– The State Language of Pakistan shall be Urdu and Bengali.

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় ভাষা শহিদদের অবদান বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিটি ভাষা সৈনিকদেরই শ্রদ্ধার সাথে চিরস্মরণীয় করে রাখবে বাঙালি জাতি। এদের মধ্যে অন্যতম একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রাজি করা। এমনকি ২১শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলে থাকা অবস্থায়ও তিনি সকলকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন কীভাবে কবে হরতাল হবে, মিছিল হবে, ধর্মঘট হবে সবকিছু। জেল থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছাড়া পেয়েও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বসে না থেকে লড়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের ১৯শে এপ্রিল ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধানে তা প্রকাশ করা হয়।

বুলেট, বেয়োনেট, নির্যাতন আর শাসনের রক্তচক্ষু অবজ্ঞা করে যেসব অকুতোভয় ভাষা সৈনিক, ভাষা শহিদ আত্মাহুতি দিয়েছেন; বাঙালি জাতি চিরকৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের অর্থাৎ সকল শহিদদের আত্মদানের মহিমা এবং বাঙালির শৌর্য ও বীরত্ব হৃদয়ে লালন করবে। তাঁদের মনে রাখবে পরম শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়।

ভাষা আন্দোলনের ভাষা সৈনিকরা এবং ভাষা শহিদরা নিজের রক্ত দিয়ে নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে এই বাংলা ভাষা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' সম্মান পেয়েছেন। এর জন্য প্রথমেই কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশের রফিকুল ইসলামের নামটি অগ্রগণ্য। তিনি আরেক প্রবাসী বাঙালি আব্দুস সালামকে নিয়ে জাতিসংঘে তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার জন্য আবেদনপত্র পাঠান। ইউনেস্কো রফিকুল ইসলামকে পত্র দ্বারা জানান, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে হলে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে ইউনেস্কো বরাবর অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কথাটি জানালে দ্রুততম সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে ইউনেস্কো বরাবর প্রস্তাবটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার প্যারিস পৌঁছায়। সেই থেকে ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত ১৮৮ দেশে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। বর্তমানে ১৯৩টি দেশে মহান শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন: বাংলাদেশ বেতার ও প্রাবন্ধিক, biplobkazi3@gmail.com

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

১৯৫২, একুশ এবং আজকের শহিদমিনার

রহিম আব্দুর রহিম

ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাস, আত্মবলিদানের মাস। বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, ভাষা দেয়নি। ১৯৫২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। মহান একুশের সাথে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর যুক্ত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। মহান একুশের সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দুই যুগ পূর্তি হতে যাচ্ছে এ বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি। চিরঞ্জীবী 'মহান একুশ' অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। রক্তঝরা ভাষা শহিদের স্মৃতিতে অম্লান এই একুশ আমাদেরকে শোক-বিহ্বল করে। আবার শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমাদেরকে চেতনাদীপ্ত করে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটেছিল ব্যতিক্রম এক ঘটনা, যা শুধু উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। মাতৃভাষা বাংলার বিরুদ্ধে যে সুগভীর চক্রান্ত চলেছিল তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বাংলার সন্তানরা। ঢাকার রাজপথ পাকিস্তানি বর্বর পুলিশবাহিনীর বুলেটের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। মায়ের ভাষা বাংলায় যাতে আমরা কথা বলতে না পারি, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা যাতে মাতৃভাষায় করতে না পারি; সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে পাকিস্তানি শাসকরা মাতৃভাষা বাংলাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে কেড়ে নিতে সুদূর পরিকল্পনায় শোষকগোষ্ঠী অগ্রসর হচ্ছিল। সমাজ তথা উপমহাদেশকে শোষকরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে বলত, 'বাংলা ভাষা পাক্ষীর ভাষা' অপবিত্র (গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আমাদের স্বাধীনতা-মাহমুদুল বাসার)। এরপর শুরু করে বাংলা লিপি পরিবর্তনের কৌশল। বাংলা লিপির বদলে আরবি লিপি প্রবর্তনের জন্য পূর্বখণ্ডে 'কুড়িটি মডেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। পশ্চিমা শোষকরা এতেও ব্যর্থ হয়। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ পাকিস্তানের বয়স মাত্র সাত মাস, বাংলাদেশের হাটে 'বেসিক ডেমোক্রেসিকে' বিকোতে এসে ভাষার প্রশ্নে আইয়ুব বলেছিলেন, 'সারি জবান্ মিলি জুলিকর, এক জবান বানা চাহিয়ে, উয়ো উর্দু নেহি। উয়ো বাংলা ভি নেহি, উয়ো পাকিস্তানী জবান।' (বাংলা নামে দেশ, পৃষ্ঠা ১৬)। অগ্নিশর্মা বাঙালি তেজোদীপ্তে দীপ্তমান হয়ে ওঠে, ১৯৫১ সালের ৬ই এপ্রিল গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় ভাষা দিবস। ১৯৫২-তে ভাষার প্রশ্নে বাঙালির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ছড়ানো হয় নীরব অঙ্কুর। ১৯৫২-এর বিস্ফোরণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে ১৯৭১-এ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যেসব বীর একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সামরিকবাহিনীর নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন; তাঁদের অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম শহিদদের রক্ত যেখানে ঝরেছিল। সেই স্থানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে ছাত্ররা একটা স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদমিনার নির্মাণ করেন। কিন্তু ভীত প্রশাসন ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পুলিশ ও সামরিকবাহিনী শহিদমিনারটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অবশিষ্ট থাকে শুধু একটি ব্লকের বেড়ায় আটকানো একটি পোস্টার, 'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরায় ধুলায় হবে হারা।' একুশের কবিতা রচিত হয়েছিল তাৎক্ষণিক আবেগে। কিন্তু ওই সময় প্রয়োজন ছিল গানের। তাই একটি কবিতাকে করা হয় গান। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কবিতা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এই কবিতাটি প্রথম আবৃত্তি করা হয় ধুপখোলার মাঠে যুবলীগের এক উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে। এই কবিতার প্রথম সুরারোপ করেন আবদুল লতিফ। আবদুল লতিফের সুরে গানটি প্রথম পরিবেশিত হতে থাকে আতিকুল ইসলামের কণ্ঠে। এরপর আলতাফ মাহমুদ গানটি নতুন করে সুরারোপ করেন। বর্তমানে আলতাফ মাহমুদের সুরেই গানটি গীত হচ্ছে। অপরদিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যেসব বীর একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সামরিকবাহিনীর নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে বুকের রক্তে ঢাকার মাটি রঞ্জিত করেছিল, তাঁদের স্মৃতি অম্লান করে রাখতে আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে ১৯৫৬-এর একুশের ভোর বিহানে মিনারের ভিত্তিপ্রস্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ সংবাদ তাৎক্ষণিক ছাত্র-জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পরে। সৃষ্টি হয় প্রতিক্রিয়া। ছাত্র-জনতার ঢল নামে মিনার এলাকায়। উপস্থিত জনতা মিনার এলাকায় এসেই দেখতে পান জনৈক পূর্তমন্ত্রী মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক জনতা এতে প্রবল আপত্তি জানান। আবু হোসেন সরকারকে ভিত্তিপ্রস্তর থেকে ছিটকে ফেলার জন্য উপস্থিত ছাত্র-জনতা ইস্যু খুঁজতে থাকেন। পেয়েও যান, পবিত্র মিনারে আবু হোসেন জুতা পায়ে আগমন করছিলেন। ইস্যুর প্রয়োজনেই জনতা ক্ষেপে যান। পরে তিনি জুতা খুলতে বাধ্য হন। যার কারণে পরবর্তীতে কেউ জুতা পায়ে মিনার বেদিমূলে যেতে সাহস পায়নি। এখনো এ রেওয়াজ যথারীতি চলছে। সরকারি পর্যায়ে আবু হোসেনের মাধ্যমে ১৯৫৬-এর শহিদমিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও উপস্থিত জনতা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ রিকশাচালক আওয়ালের ৬ বছর বয়সি কন্যা বসিরনকে দিয়ে। বসিরনের সাথে ভিত্তিপ্রস্তরে যোগ দেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহিদ বরকতের মাতা হাসিনা বেগম। ১৯৫৭ সালে মিনারের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল আইনসভায়। 'বাংলা একাডেমী এ্যাক্ট' ১৯৫৭ পাস করা হয়। ওই সময় শহিদমিনারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এম. এ জব্বারের ওপর। জব্বার সাহেব এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

তখন লন্ডন ফেরত শিল্পী হামিদুর রহমানকে মিনারের একটি মডেল তৈরি করতে বলেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গৃহীত শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর মাসে শহিদমিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং একটানা কাজ চালিয়ে ১৯৫৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মধ্যে শহিদমিনারের মূলবেদি এবং তিনটি স্তম্ভ সমাপ্ত হয়। এরপর ১৯৬২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল আজম খান পরিকল্পিত মিনারটি পুনঃনির্মাণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মাহমুদ হোসেনকে সভাপতি করে চৌদ্দ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শহিদমিনারটি স্থাপন করার সুপারিশ করলে তা পুরোপুরি কাজে লাগে না। ছোটো আকারে ১৯৬৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শহিদমিনারের কাজ শেষ করা হয়। ১৯৬৩ সালের একুশে নবনির্মিত এই শহিদমিনারটির উদ্বোধন করেন শহিদ আবদুল বরকতের বাহাত্তর বয়স্কা মাতা হাসিনা বেগম। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই মিনার বাঙালির সকল সংস্কৃতির কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভাষার প্রশ্নে শহিদদের স্মৃতি জড়িত শহিদমিনার ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর এক পর্যায় পাকিস্তান সামরিকবাহিনী ২৬ ও ২৭শে মার্চ ভারী গোলাবর্ষণ করে শহিদমিনারের স্তম্ভগুলো ধ্বংস করে দেয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ দিবসটি পালন করেছিলেন ওই ভাঙা শহিদমিনারেই। পরবর্তীতে ১৯৭২-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সভাপতি করে শহিদমিনার পুনঃনির্মাণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির কেবলমাত্র স্থপতিদের কাছ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে নকশা ও পরিকল্পনা আহ্বান করেন। শিল্পী হামিদুর ছিলেন না বলেই তিনি বিশিষ্ট স্থপতি এম. এস জাফরের সঙ্গে মিলিতভাবে একটা সংস্থা গঠন করে নকশা প্রণয়ন করেন। সরকারি অনুমোদন থাকলেও তাদের তৈরি মডেল শহিদমিনার নির্মিত হয়নি। ১৯৫২ সালের একুশের আন্দোলন ছিল আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা বাঙালি জাতিসত্তা নিরূপণের আন্দোলন। প্রকৃতঅর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজবপন করা হয়েছিল ওই আন্দোলনের মাঝেই। উল্লেখ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬ স্তম্ভ বিশিষ্ট শহিদমিনারের তাৎপর্যের গভীরতা বিশাল। মিনারের মাঝের দুই স্তম্ভ 'মায়ের প্রতিকৃতি' ডানে এবং বামের দুটি করে স্তম্ভ ভাষার জন্য রক্তদানকারী 'শহিদ সন্তানদের প্রতিকৃতি'।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হন। গোটা বাঙালি জাতি ফিরে পায় স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামের একটি রাষ্ট্র। যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া দেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় দেশ বিদেশের চক্রান্ত। ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সপরিবারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। বিদেশে অবস্থান করায় বেঁচে যান পিতার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। রাষ্ট্রের ক্ষমতার হাতবদল ঘটতে থাকে অভিনব পন্থায়। ১৯৯৬ সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র বিনির্মাণের অসমাপ্ত কার্যক্রম। ওই সময়ে শেখ হাসিনা 'ভাষা সংস্কৃতির উন্নয়নে' ব্যাপক অবদান রাখেন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিকভাবে মোট ১১টি ভাষণে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। তিনি তাঁর প্রতিটি আন্তর্জাতিক ভাষণে দীপ্তকণ্ঠে দাবি তুলে ধরেন– 'মে দিবস যদি আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে, তবে কেন মাতৃভাষা বাংলার জন্য আত্মবলিদানকারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ মহান একুশকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে না।' তাঁর দাবি গুরুত্ব পেয়েছে, প্রবাসী বাঙালি সালাম ও রফিক নামের দুই ব্যক্তির সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর। ওই সময় আপামর ছাত্রজনতা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে 'ভাষাকন্যা' হিসেবে ভূষিত করেন। বাংলা ভাষা চালুর দাবি দানা বাঁধে সর্বস্তরে। ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে চালুর দাবিটি উপেক্ষিত হতে থাকে। ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল। ক্রীড়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসার এবং সংরক্ষণে নতুন করে শুরু হয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। ২০০৯ থেকে ২০২৩-এর ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর দাবিটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেশের উচ্চ আদালতই ১৪৯টি রায় বাংলা ভাষায় দিয়েছে। এখনো উচ্চ আদালতের রায় বাংলা ভাষায় দেওয়া হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণের উদ্বোধন হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটসহ পুলিশ সুপারদের ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ হয়েছে। এছাড়াও দেশের ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ৫৫টি জেলা কারাগার, ৩৩১টি পৌরসভা, ৬৫২টি পুলিশ স্টেশন, ৪৯৫টি উপজেলা, ৪৫৭১টি ইউনিয়নের প্রশাসনিক ওয়েবসাইট বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের সকল স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার ওয়েবসাইট বাংলায় সংস্করণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন।

এখন প্রয়োজন মাতৃভাষা বাংলার সুমিষ্ট স্বাদ গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় ছড়ানো। ভুলে গেলে চলবে না অর্থনৈতিক আগ্রাসন একটি জাতিকে দরিদ্র করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিশ্চিহ্ন করে সেই জাতিকে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিটুকু সফল হোক, এদেশের মানুষের মন মানসিকতা, জীবনবোধের সমান্তরাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশ এবং জনমানবের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জাতিসত্তার স্বরূপের মধ্য দিয়ে।

রহিম আব্দুর রহিম: শিক্ষক, শিশু সাহিত্যিক, সব্যসাচী লেখক ও গবেষক

ভাষা আন্দোলনের নাট্য দলিল ও মুনীর চৌধুরী

রহিমা আক্তার মৌ

সবগুলো পত্রিকা ঘরে না আসলেও সাহিত্য সাময়িকীগুলো ঠিক সময়ে এসে যায়। তিন বয়সি মা-মেয়ের অনেক আকর্ষণ এই পাতাগুলোর উপর। এইমাত্র সাহিত্য পাতায় একটা গল্প পড়লাম, প্রথম থেকে গল্পটার প্রতি খুব আকর্ষণ না থাকলেও মাঝপথে টান বেড়ে যায়। শেষটুকু পড়ে খুব অট্টহাসি পেল। পাশের রুম থেকে দৌড়ে এলো ছোটো মেয়ে। ও এবার প্রাইমারির শেষ দিকে। 'মা এত জোরে হাসলে যে।' এসে দেখে পত্রিকাটি এখনও হাতে। ওকে গল্পের সারমর্ম বললাম। আমার সারমর্ম শেষ হবার সাথে সাথে ও বলতে লাগল– 'জানো মা আজ ক্লাসে একটা মেয়ে আমাকে গল্প শুনালো, গল্পটা ভালো ছিল তবে আমি মজা পাইনি। কারণ গল্প বলতে গিয়ে মেয়েটি অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করল। যা আমার ভালো লাগেনি। অসহ্য, বাংলা গল্প বলছে অথচ মাঝে মাঝেই ইংরেজি শব্দ, তুমিই বলো এটা কি ঠিক?' ওর কোনো কথার জবাব আমার কাছে ছিল না। কিছুটা অভিনয় করে পাশ কেটে গেলাম। চলছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। চারপাশে বাংলা ভাষাকে নিয়ে চলছে অনেক আলোচনা-সমাবেশ; তার উপর আমাদের অমর একুশে গ্রন্থমেলা। বইমেলা যেন ভাষার মেলা, বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করে নেবার মেলা। মনের ভেতর প্রশ্ন, সত্যিই কি সেই ১৯৪৭ সাল থেকে সংগ্রাম করা ১৯৫২ সালের ভাষা আবেগ-ভালোবাসার সে ভাষা কি সর্বস্তরে চালু আছে বা চালু হচ্ছে?

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নিজের পৈতৃক বাড়ি সেন্ট্রাল রোডে সপরিবার তিনি অবস্থান করছিলেন। দুপুর ১টার পর অপরিচিত যুবকরা এসে ওয়ারেন্ট আছে বলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় তাঁকে। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি ফিরলেন না। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের উল্লাস চারপাশে, সে দিনও তাঁর কোনো খোঁজ নেই। বিজয়ের পর ১৭ই ডিসেম্বরও ফিরলেন না। ফিরলেন না আর কোনোদিন, স্বাধীনতার পর তাঁকে অনেক খুঁজেছেন, পরিবার-পরিজনেরা পায়নি। বাসা থেকে তাঁকে নেওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটের পাকিস্তানি শিবিরে। সেখানেই নির্যাতনের পর হত্যা করা হয় তাঁকে। লাশ খুঁজে পায়নি তাঁর পরিবার, তবুও তাঁদের বিশ্বাস ছিল তিনি বেঁচে আছেন। সেই বিশ্বাস ভেঙে গেল। কখনও তিনি আর ফিরলেন না।

বলছি ভাষা আন্দোলনের একমাত্র নাট্য দলিলের নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর কথা। পুরো নাম আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী। একাধারে একজন সফল শিক্ষক, ব্যতিক্রমী নাট্যকার, সমালোচক ও দক্ষ অনুবাদক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের যে উল্লেখযোগ্য নাট্য দলিলাদির কথা আমরা জানি তার সাথে মুনীর চৌধুরীর প্রাণ জড়িয়ে ছিল। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইন দেখিয়ে ২য় বারের মতো গ্রেপ্তার করা হয় মুনীর চৌধুরীকে। বন্দি কারাগারে অলস সময় পার করছেন তিনি। দিন যায়, রাত আসে, মাস গড়িয়ে মাস এইভাবে ১৯৫২ শেষ হয়ে ১৯৫৩ সাল এলো। রাজনৈতিক জীবনে মুনীর চৌধুরী বামপন্থি ছিলেন। কমিউনিস্ট বন্দিরা কারাগারে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে চাইলে তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হলো মুনীর চৌধুরীকে একটা নাটক লিখে দেবার জন্য।

বন্দিদের সাথে কোনো নারী ছিল না বলে এও বলা হয় যে– নাটকে নারী চরিত্রটা এমন করে দেওয়া হবে যেন চরিত্রটা পুরুষরা করতে পারে। আর রাতের অন্ধকারে জেলখানায় তারা নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নারী চরিত্র ছাড়াই একটি নাটক তৈরি করেন মুনীর চৌধুরী। বন্দি অবস্থায় অনেক ছাত্র লেখাপড়া করত। ছাত্রদের পড়ার জন্য ছিল কয়েকটি হারিকেন। সবগুলো এক করা হলো। সেই হারিকেনগুলো দিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে তাঁর লেখা নাটকটি মঞ্চস্থ করা হলো। সেদিনের মঞ্চস্থ সেই নাটকটি একুশের অমর নাটক 'কবর'। আজও ভাষা আন্দোলনের একমাত্র নাট্য দলিল হয়ে রয়েছে 'কবর' নাটকটি।

১৯৫২ সালের ২৭শে নভেম্বর নোয়াখালী জেলার গোপাইরবাগ গ্রামে বাবা আবদুল হালিম ও মা আফিয়া বেগমের কোলে জন্মগ্রহণ করেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৪৩ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইএ পাস করার পর মুনীর চৌধুরী বামপন্থি সংগঠন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সাথে জড়িয়ে পড়েন। লেখাপড়ার পাশাপাশি রাজনীতি আর সাহিত্য তাঁকে আকৃষ্ট করত। রাজনীতি বা বামপন্থির সাথে যোগ দিলেও পড়ালেখায় ছিলেন সিরিয়াস। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং ১৯৪৭ সালে মাস্টার্স পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুনীর চৌধুরীর জীবনের একটি বিশাল অংশ।

মুসলিম শাসনামলে এদেশের সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। ইংরেজ শাসনামলে প্রায় ২১ বছর ইংরেজি ছিল এ দেশের সরকারি ভাষা। সেই সাথে কিছু কাল ফারসিও ছিল। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজিই ছিল। এরপর ছাত্র আন্দোলনের ফলে বিএ পাস পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হয় বাংলা। ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে অফিস-দোকান-গাড়ি সবকিছুর নাম ও নাম্বার বাংলায় লেখা শুরু হয়। এরই দৃষ্টিতে সবার মনে হতে থাকে যে, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়বে। কিন্তু তা হয়নি।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছিল উর্দুকে। এর ফলে শুরু হয় ভাষা

আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা *বাংলা না উর্দু* শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তমদ্দুন মজলিস যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম। বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে আন্দোলন জোরদার শুরু হয়। যে যেভাবে পারছে ভাষার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি নিয়ে রাজপথে নামা বাঙালির ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকচক্র। শহিদ হয়েছিলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেক নাম না জানা মানুষ। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেওয়ার এমন ঘটনা ইতিহাসের কোথাও নেই। সেই আত্মদানের স্বীকৃতি ছিল আমাদের মাতৃভাষা। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে আজ একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হচ্ছে সেই অমর শহিদদের, যাঁরা ভাষার জন্য তাদের জীবন দিয়ে গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র বাংলার প্রচলন নিশ্চিত করতে সক্ষম হইনি। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিচ্ছি। সাইনবোর্ড, ব্যানার, বিজ্ঞাপন, সরকারি দপ্তরের নথি, সংবাদ মাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্রই রয়েছে ভুল বানানের ছড়াছড়ি। ১৯৩৬ সালে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম করেছে। অথচ আমরা বাংলা লিখছি যে যার মতো।

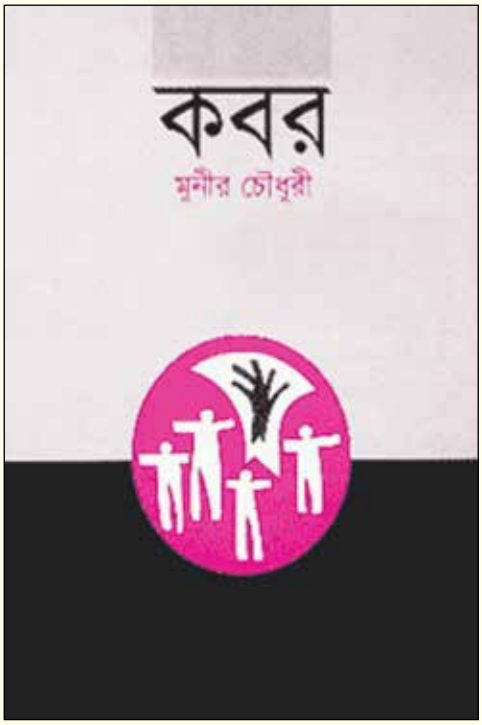

রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে যে উচ্চ পর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে আমরা কি পারছি তা প্রতিষ্ঠা করতে। মনে হচ্ছে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে আর ফেব্রুয়ারি মাস আসলে বাংলা ভাষা স্বাধীনতা পায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। পরিতাপের বিষয় হলো সরকারি বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে এখনো বাংলা ভাষার ব্যবহার খুব কম। এখনো দাপটের সাথে সেসব জায়গায় চলছে ইংরেজির প্রাধান্য। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বেসরকারি খাতে ব্যাবসাবাণিজ্যে বাংলা ভাষার স্থান নেই বললেই চলে।

১৯৪৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি ইসলামি আদর্শের নামে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড প্রচলিত সমস্ত ভাষার আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। ১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারি পূর্ব বাংলার সর্বত্র পালিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা দিবস'। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুপুরে ঢাকার সব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছায়। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও বুলেটের সামনে পড়ে ছাত্ররা। রফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ ভাষা সৈনিকদের জীবনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা পায় বাংলা ভাষা।

২২শে ফেব্রুয়ারি গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি মুনীর চৌধুরীকে আটক করে আড়াই বছর বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। ছেড়ে দেবার পর ১৯৫৫ সালে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫০ ও ৬০ দশকের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুনীর চৌধুরী সোচ্চার ছিলেন। ১৯৬৬ সালে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচারে পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলা বর্ণমালাকে রোমান বর্ণমালা দিয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নিলে তিনি তারও ঘোর বিরোধিতা করেন।

প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধি ও কলম। নাটকের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর অবদান অতুলনীয়। বামপন্থি হওয়ায় প্রতিপক্ষের কাছে রাজনীতিক মনোবাদের কারণে পরাজিত হন তিনি। অবশ্য রাজনৈতিক জীবনে তাঁর সময় কাটে খুব কম। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও তিনি বলেছেন, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আমরা স্বাধীন হব, বিজয় আমাদের। স্বাধীনতা ঠিক এসেছে তবে ফেরেননি মুনীর চৌধুরী। ভাষা আন্দোলন ও নাট্য দলিলের নাট্যকার হিসেবে মুনীর চৌধুরী বাংলা ভাষার সাথে মিশে থাকবেন। থাকবেন আমাদের অস্তিত্বের অংশ হয়ে।

স্বীকৃতি পাওয়া বাংলা ভাষা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। এই দিনই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এক মাত্র কুমিল্লার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই উদুর্কে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ করেন এবং উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। কোন বাঙ্গালি মুসলমান প্রতিবাদ করেনি। এটা লজ্জাজনক ইতিহাস। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না। বাঙ্গালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারী অফিস, আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করবো না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।' (১৯৭১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি, *আজাদ, সংগ্রাম, ইত্তেফাক* সূত্রে)

রহিমা আক্তার মৌ: সাহিত্যিক কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক, rbabygolpo710@gmail.com

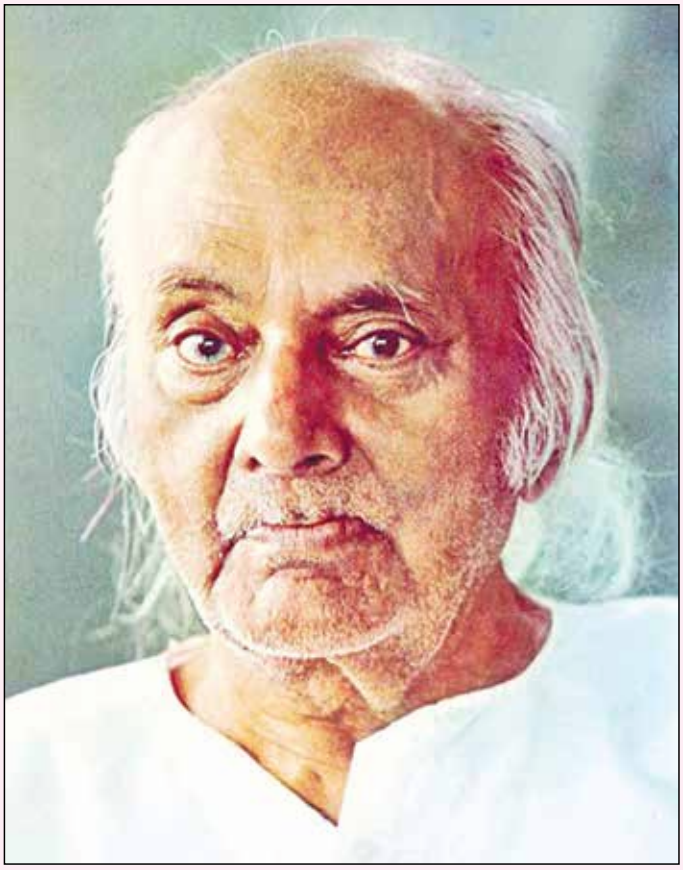

অবিনাশী অগ্নিবীণা : নজরুলের বিপ্লবী চেতনা

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক আমলে অখণ্ড ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন। নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কিছুকাল সৈনিক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁকে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের বিভিন্ন অন্দোলন গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি কতগুলো রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় রাজরোষের কবলেও পড়তে হয়। নজরুলের সেই সময় ঔপনিবেশিক রাজশক্তির অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার কবিমানসে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। সেসব ঘটনা তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। নজরুলের কবিতায় রয়েছে দেশাত্মবোধ, উদ্দীপনা, মানবতা, যৌবনকে জাগিয়ে তোলা, প্রেম ও প্রকৃতি, ইসলাম বিষয়ক, শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ প্রভৃতি। তাঁর দ্রোহ, প্রেম, বিশ্বাস, মাটি-মানুষ-মাতৃভূমির প্রতি অনুধাবন সকলের শিক্ষণীয়। নজরুলের কবি কল্পনা মানবতাবোধ ও সমকালীন সমস্যা একে অপরের পরিপূরক।

অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের কবিতাশৈলীতে বিষয়বস্তু, গঠনকৌশল, লক্ষ্য, সমাজ-বাস্তবতা, সমাজ-সচেতনতা যেমন রয়েছে তেমনি কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহের প্রতিফলনের মাধ্যমে সামাজিক জাগরণের চিত্র প্রস্ফুটিত হওয়ায় আপামর জনগণ নতুন জীবন চেতনায় এক অবলম্বন খুঁজে পায়। এছাড়াও রোমান্টিক ভাবনা সবকিছুতেই কবিমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাইতো নজরুল সময়ান্তরেও প্রাসঙ্গিক। যার ফলে মানবচিত্তে সোনার ছেলে, সোনার মানুষ, সর্বমানবিক কবি হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। নজরুল মানবতা ও বিপ্লবী চেতনা ধারণ করে অচলায়তন ভেঙে ফেলার অবিরত চেষ্টা করেন। তাঁর বিপ্লবী চেতনার প্রতিফলন ব্যাপকভাবে *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'বিদ্রোহী'তে বিশেষভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। অবিনাশী *অগ্নিবীণা* নজরুলের বিপ্লবী চেতনার এক মহাসম্পদ।

নজরুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক আমলে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার কথা বললে, দেশের মানুষের কষ্টের কথা বললে চোখ রাঙিয়ে শাসন করেছে। অধিকারের কথা, স্বাধীনতার কথা প্রকাশ করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছে। সেই সময় প্রচলিত ব্যবস্থাটি কোনো একক সিস্টেমে ছিল না। অর্থাৎ একই কর্তৃপক্ষ দেশের শাসনব্যবস্থা, ধর্মজীবন, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, তথা বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা– এসব কিছু এক হাতে নিয়ন্ত্রণ করত না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে কিছু অনুচর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে, অর্থাৎ এগুলোর নিয়ন্তা ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রায়শই পরস্পরবিরোধী কর্তৃপক্ষ, যাদেরকে অর্থডক্সি বা অধিষ্ঠিত তন্ত্র বলতে পারি। সেই সময় পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল নজরুলের মধ্যে। নজরুল ব্রিটিশ রাজশক্তির চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা না করে– *ধূমকেতু* পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রথমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন। এই দাবিটি ১৯২২ সালের *ধূমকেতুর* ১৩নং সংখ্যায় ১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়। নজরুলের বহুমাত্রিক বিদ্রোহ থেকে উৎসারিত হয় নানারকমের প্রতিবাদী সাহিত্য। স্বদেশি-বিপ্লবী যুগে নজরুল যে আন্দোলন করেছেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে কতখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সেটা সকলেরই জানা। তাইতো নজরুলের প্রতিবাদী সাহিত্য মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। নজরুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির প্রচলিত ব্যবস্থার অন্তত ৬টি অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সেগুলো–

১. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র।
২. ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির গান্ধীবাদী মূলধারা।
৩. মুসলিম মৌলবাদী শক্তি।
৪. হিন্দু সমাজ-যন্ত্র ও সাংস্কৃতিক অহমিকা।
৫. হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক চক্র এবং
৬. রবীন্দ্রকেন্দ্রিক সাহিত্যসেবী সংঘ।[১]

নজরুলের সৃজনে *অগ্নিবীণা* কাব্যের কবিতাগুলোয় বিদ্রোহমূলক, সম্ভাবনামূলক, জাগরণমূলক, ধর্মীয় ভাবধারামূলক অস্তিত্ব রয়েছে। নজরুলের বিদ্রোহমূলক কবিতা পরবর্তীকালে আধুনিক কবিদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে। বাঙালি মানসের নবজাগরণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নজরুলের বিপ্লবী ভূমিকা রয়েছে। নজরুল যে-কোনো দেশের যে-কোনো মানুষের সামাজিক জাগরণকে

অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাইতো নজরুল গণমানস জাগৃতিমূলক এক মহান শিল্পস্রষ্টা। দর্শন চৌধুরী বাংলা কাব্যে নজরুলের আবির্ভাবকে ৪টি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেন। সেগুলো হলো–

১. তিনি মাটির মানুষের জীবন সংগ্রামের কবি।
২. তিনি প্রকৃত অর্থেই 'সর্বহারা'।
৩. তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা।
৪. তিনি শোষক ও শোষিতের নিরন্তর সংগ্রামের পক্ষে সংগ্রামী চেতনার অধিকারী।[২]

নজরুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক আমলে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে দুর্বাসার মতোই তেজের অধিকারী বলে অভিহিত করেন। দুজনই বিদ্রোহী। নজরুল কাব্যে আর বারীন্দ্রকুমার রাজনীতিতে। কিন্তু পরাধীনতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দুজনের চিন্তা অভিন্ন। নজরুল ও বারীন্দ্রের সুর পরাধীনতার মুক্তির তালে বেজে উঠেছিল। তিনি মনে করতেন বারীন্দ্রের অগ্নিসুরে এখনো রক্ত শিখা বাজে। তাই নজরুল *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী অগ্নিযুগের সাহিত্যিক ও বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে (১৮৮০-১৯৫৯) উৎসর্গ করেন। তাঁর অগ্রজ রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাত্মসাধক অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)। ঔপনিবেশিক আমলে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তিকে বোমা মেরে ধ্বংস এবং সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিতাড়নের জন্য বোমারু বারীন্দ্রকুমার নামে দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। নজরুল বৈপ্লবিক চৈতন্যে লালিত হওয়ায় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে *অগ্নিবীণা* উৎসর্গ করে অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য, *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমূলক, কবি চৈতন্যের এক অমোঘ নির্দেশক। নজরুল রচিত বিশ্ব কাঁপানো 'বিদ্রোহী' কবিতাটি *অগ্নিবীণা* কাব্যে সংকলিত হয়। *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটিতে ১২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শিরোনামগুলো যথ াক্রমে– 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত্-ইল্-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানি', 'মোহর্‌রম'। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি সেই কালের মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ছোটো ভাই অগ্নি-ঋষি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। নজরুল কেন *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি বারীন্দ্রকুমারকে উৎসর্গ করেন এই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন–

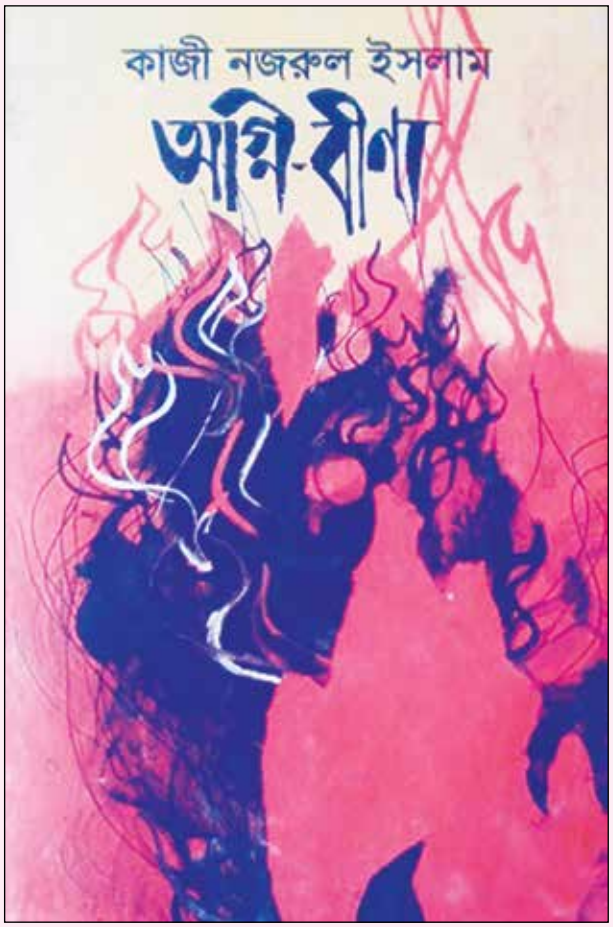

বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরা থাকতেন শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রিটে। তাঁদের সাপ্তাহিক *বিজলী*ও প্রকাশিত হতো ওই ঠিকানা থেকেই। চিত্তরঞ্জন দাশের (তখনও দেশবন্ধু হননি) মাসিক কাগজ *নারায়ণে*র পরিচালনার ভারও ছিল বারীন ঘোষদের হাতে। নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁদের তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি। কিন্তু তাঁরা নজরুলের বাঁধন-হারা হতে (তখন *মোসলেম ভারতে* ছাপা হচ্ছিল) ছোটো ছোটো অংশ *নারায়ণে* তুলে দিয়ে তার ওপরে ভালো মন্তব্য লিখতেন। 'আদি পুরোহিত' ও 'সাগ্নিক বীর' রূপে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ওপরে নজরুলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল! তার ওপরে তাঁর লেখা সম্বন্ধে ভালো কথা বলছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে নজরুলের আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। সে তখন ছন্দে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একখানা ছোট্ট পত্র লেখে। ১৯২০ সালের এই ছন্দোবদ্ধ পত্রখানাই হচ্ছে ১৯২২ সালে মুদ্রিত *অগ্নিবীণা*র উৎসর্গের গান।

... বারীন্দ্রকুমারকে লেখা নজরুলের ছন্দোবদ্ধ পত্রখানা তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিল শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বারীন্দ্রকুমার এই পত্র পড়ে নাকি বলেছিলেন, 'নজরুল আমায় গাল দিল নাকি?' এই পত্র পাঠানোর পরই নজরুল ভাবল যে এবার সোজাসুজি বারীন ঘোষদের বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে, বিশেষ করে বারীন ঘোষের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহে নজরুল অধীর হয়ে পড়েছিল। তাই, একদিন সন্ধ্যার পর সে মোহনলাল স্ট্রিটে গেল। ... নজরুলরা যখন বারীন ঘোষের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছল, তখন দেখা গেল যে তাঁদের নিচের ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে যে কথার্বাতা হচ্ছে তারও আওয়াজ নজরুল শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সেই বাড়ির লোকেরা টের পেলেন যে বাইরের লোক আসছেন অমনি আলো বুজে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভেতর থেকে দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। অনেক লোক অসময়ে এসে অকারণে সময় নষ্ট করতেন বলে বারীন ঘোষেরা এই কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই ব্যবস্থা নজরুলের ওপর কাজ করবে কেন? সে এমন হৈ-হল্লা ও চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে তৎক্ষণাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠল এবং দরজাও খুলে গেল। ... বারীন বাবুদের সঙ্গে নজরুলের এই যে পরিচয় হলো সেই পরিচয় হৃদ্যতায় পরিণত হলো। এই হৃদ্যতা বরাবর বজায় ছিল।' [৩]

অগ্নিবীণা গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেন চিত্রকর সম্রাট শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁকেছেন চিত্রশিল্পী বীরেশ্বর সেন। সমালোচকদের ধারণা রবীন্দ্রনাথের 'অগ্নি-বীণা বাজাও তুমি/ কেমন করে' এই গানটি থেকে অগ্নিবীণা নামটি নেওয়া হয়েছে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, কপি সংখ্যা ছিল দুই হাজার। কপির পরিমাণ জেনে আনন্দে মন ভরে যায়। সেই সময় রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান প্রেস ছিল 'মেটকাফ' প্রেস। এই প্রেস থেকেই *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরিকল্পনা কার্যকর হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রী ব্রজবিহারী বর্মণ লিখেছেন–

মেটকাফ প্রেসই ছিল আমাদের রাজনৈতিক পুস্তকাদি প্রকাশের একমাত্র সহায়। প্রেসে এক টেবিলে বসেই আমি এবং কাজীদা ... প্রুফ দেখি। ভালো করে প্রুফ দেখার কৌশল আমি তাঁর কাছ থেকেই শিখি। ... ধূমকেতুর বিজ্ঞাপনে গ্রাহকরা 'অগ্নিবীণা'র জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। ... অর্থাৎ পাবলিশিং হাউসের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের সম্মতি আদায় করি। ...[৪]

নজরুল *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী সময়ে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাজীবন অতিবাহিত করেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার দায়ে ঔপনিবেশিক রাজশক্তির দ্বারা নজরুলকে জেলজীবনের স্বীকার হতে হয়। সেই সময় *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৯২৩, জানুয়ারি) *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের ওপর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অংশবিশেষ–

বিদ্রোহীর বীর কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাংলাদেশে পরিচিত কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'তেই কাজী সাহেবের 'হাতে-খড়ি' হইয়াছিল। ... দ্বাদশটি বাছাবাছা কবিতা আছে। এতদিন বাংলার কাব্যকুঞ্জে প্রেমের কবিতাই অজস্র ফুটিত, বীর-বীণার ঝংকার ক্বচিৎ শুনা যাইত। কিন্তু অগ্নিবীণার প্রত্যেকটি কবিতাই বীরত্ব ব্যঞ্জক-মরণোন্মুখ জাতীয় প্রাণে নবউদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। নৃত্য দোদুল ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গিমা বিকাশে কবি অপূর্ব গুণপনা দেখাইয়াছেন। কবি বাঙালী পল্টনে হাবিলদারের কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, 'কামাল পাশা' কবিতায় তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে ইহা একবারে অভিনব জিনিস। কবির এই বীরভাব অনেক কবিতাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া কবি যে সব অনুপম উপমা সংযোজন করিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। ... কবি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটখানি পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।[৫]

নজরুলের চেতনায় বিদ্রোহ ছিল প্রবল। তাইতো তিনি বিপ্লবী কবি হিসেবে জনমানসের কাছে জনপ্রিয়। ঔপনিবেশিক রাজশক্তির সময়ে আবির্ভূত হয়ে তিনি সমসাময়িকতাকে ধারণ করলেন। দায়িত্ববোধ থেকে সমসাময়িকতাকে ধারণ করে এক বিপ্লবী কণ্ঠস্বরে পরিণত হলেন। তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। নজরুল ঔপনিবেশিক রাজশক্তির চক্ষুশূলে পরিণত হন। ঔপনিবেশিক রাজশক্তি নজরুলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কিছু সৃষ্টিশীল কাজ বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে অনুবাদের ব্যবস্থা করে। উদাহরণ হিসেবে–

১৯২২ থেকে ১৯৩১ এ মধ্যে ১টি প্রবন্ধগ্রন্থ ও ৪টি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯২২ এর ২৬ অক্টোবর প্রকাশিত প্রবন্ধসংকলন 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর; ১৯২৪ এর ২২ অক্টোবর বাজেয়াপ্ত হয় কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী', আর ওই বছরই ১১ নভেম্বর নিষিদ্ধ হয় 'ভাঙারগান'। 'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয় ১৯৩১ এর ১৪ সেপ্টেম্বর। ১৯৩১ এর ১৪ অক্টোবর 'চন্দ্রবিন্দু' গীতিসংকলন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এই ৫টি বই বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও অগ্নিবীণা, 'ফণিমনসা', 'সঞ্চিতা' ও 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ এবং 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। তবে 'রুদ্রমঙ্গল' আর না ছাপার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬]

নজরুল রচিত *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটিতে অন্যায়-অত্যাচার, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মনোভাব ফুটে ওঠে। কবিমানসের সেই মনোভাব পরাধীনতার বিরুদ্ধে জনমানসের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধের প্রতিফলন সৃষ্টি হয়। ইতঃপূর্বেও *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের শিরোনামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। শিরোনামগুলো– 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী',

'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত্-ইল্-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানি', 'মোহর্‌রম'। *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সম্পর্কে একটি চুম্বক আলোচনা নিম্নরূপ–

প্রলয়োল্লাস: নজরুল 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় অচলায়তনকে ভেঙে নতুনকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি ধ্বংসকে ভয় না করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। সুন্দরের মাঝ দিয়ে নতুন সম্ভবনা এসে পৌঁছবে। এটা চিত্তে লালন করতেন।

বিদ্রোহী: নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতায় সামাজিক জাগরণে মিথের ব্যবহার করেন। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে এবং বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যে পুরাণের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। নজরুলও বিভিন্ন কবিতায় পুরাণের ব্যবহার করেছেন সাবলীলভাবে, দক্ষতার সাথে এবং শিল্পময়তার প্রয়োগে। বিদ্রোহী কবিতায়ও পুরাণের ব্যবহার করেছেন নিজস্ব চৈতন্যে অনায়াস সাধ্যে যথোপযুক্ত মহিমায়। কবিতার উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় পুরাণকে নতুন বিন্যাস ও উপলব্ধিতে সন্নিবেশিত করেছেন। নজরুল পুরাণের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে কবিতায় স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি কবিতায় হিন্দু, মুসলিম, গ্রিক প্রভৃতি পুরাণকাহিনি ব্যবহার করে বিদ্রোহী কবিতাকে দিয়েছেন অনন্য মাত্রা। নজরুল তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় অসংখ্য মিথ তুলে ধরেন। যেমন: 'বল', 'আরশ', 'নটরাজ', 'ধূর্জটি', 'হোম-শিখা', 'সাগ্নিক', 'জমদগ্নি', 'যজ্ঞ', 'অগ্নি', 'ইন্দ্রাণী', 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী', 'রণ-তূর্য', 'কৃষ্ণ-কণ্ঠ', 'ব্যোমকেশ', 'গঙ্গোত্রী', 'মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক', 'বজ্র', 'ঈশান', 'বিষাণে', 'ওঙ্কার', 'ইস্রাফিল', 'পিনাক-পাণি', 'ডমরু', 'ত্রিশূল', 'ধর্মরাজ', 'চক্র', 'মহাশঙ্খ', 'প্রণব-নাদ', 'দুর্বাসা', 'বিশ্বামিত্র-শিষ্য', 'বোর্‌রাক্', 'উচ্চৈঃশ্রবা', 'বাড়ব-বহ্নি', 'কালানল', 'বাসুকি', 'জিব্রাইল', 'আফিয়ার্স', 'শ্যাম', 'হাবিয়া দোযখ', 'বিষ্ণু', 'ছিন্নমস্তা', 'চণ্ডী', 'রণদা', 'জাহান্নাম', 'পুরুষোত্তম', 'পরশুরাম', 'নিঃক্ষত্রিয়', 'বলরাম', 'ভৃগু', 'সূদন' প্রভৃতি। এমন নিরঙ্কুশ প্রণোদনায় বিচিত্র শব্দের প্রয়োগ বাংলা কবিতায় প্রণয় ও প্রমিতির সঙ্গে আর দেখা যায়নি। ফলে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি সময় অতিক্রম করে কালের দেয়ালে চিরকালের জন্য খোদিত হয়ে রইল। নজরুল বিদ্রোহী কবিতার চরণে চরণে অপূর্বভাবে প্রয়োগ করেছেন মিথ প্রসঙ্গ।

রক্তাম্বরধারিণী মা: নজরুল 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় ঔপনিবেশিক রাজশক্তির উৎপীড়ন-লাঞ্ছনার কথা তুলে ধরেন। তিনি উৎপীড়ন-লাঞ্ছনার অবসান কামনা করেন।

আগমনী: নজরুল 'আগমনী' কবিতায় মা দুর্গার সাথে যুদ্ধ করে যেমন অসুর বিনাশ হয়েছে, তেমনি ঔপনিবেশিক রাজশক্তির হাত থেকে পরাধীন ভারতবাসী মুক্তি পাবে।

ধূমকেতু: নজরুল 'ধূমকেতু' কবিতার মাধ্যমে মানব মুক্তির জন্য সকলের সামনে হাজির হয়েছিলেন। এই কবিতাটির মাধ্যমে নবজীবন পাওয়ার চেষ্টার সুর চিত্রিত হয়েছে।

কামাল পাশা: নজরুলকে তুরস্কের রাজনৈতিক ঘটনাবলি অনুপ্রাণিত করে। ঔপনিবেশিক রাজশক্তির হাত থেকে পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রত্যাশায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে শৌর্যবীর্য এবং প্রশংসা এবং তা থেকে দেশবাসীকে শিক্ষা গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে 'কামাল পাশা' কবিতাটি রচনা করেন। 'কামাল পাশা' প্রসঙ্গে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'বঙ্গবাণী' লিখেছিল– তুর্কির নব-সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার নামে যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে সেটি বঙ্গ সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। ... যুদ্ধের অভিযানে জয় ডঙ্কার তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস এই 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে পাই তাহা এ দেশের সাহিত্যে নতুন।[৭]

আনোয়ার: নজরুল 'আনোয়ার' কবিতায় এক তরুণ বন্দির কণ্ঠে বিশ্বের মুসলিম জাহানের কথা বলার চেষ্টা করেন। কবি এখানে আনোয়ারের শৌর্যবীর্যের কথা তুলে ধরেন। এই কবিতাটিতে তদানীন্তন পরাধীন ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে সামাজিক জাগরণ সঞ্চারণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

রণ-ভেরী: নজরুল 'রণ-ভেরী' কবিতায় আত্মবিশ্বাসের সাথে বাস্তবকে মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানান। কবি হাসিমুখে সত্য-ন্যায় সংগ্রামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করেন।

শাত্-ইল্-আরব: মানব কল্যাণের অগ্রপথিক কাজী নজরুল ইসলামের 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটির প্রেক্ষাপট ও কাব্যসৌন্দর্যে বলা যেতে পারে, নবনীত কোমল ভাষায় তিনি এই কবিতাটি ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুল বিশ শতকের বিশের দশকে সেনা পরিবার জীবনের সমাপ্তিতে করাচির অভিজ্ঞতা সাথে নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পরে তাঁর সাহিত্যজীবনের বিস্তৃতির পাশাপাশি সাংবাদিকতার নবারুণ পর্ব গড়ে ওঠে। নজরুল সে সময় কলকাতায় এসে 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটি লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। এই কবিতায় আরবের ঐতিহ্যবাহী নদীবন্দনা ফুটে উঠেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই নদীর তীরে ব্যাপক লড়াই হয় তুর্কি ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে। ইংরেজ বাহিনীতে ভারতীয় সেনারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হয় পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয় সমগ্র মেসোপটেমিয়া। নজরুল 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতায় বীরের রক্তে রঞ্জিতের কথা তুলে ধরেছেন। এই নদী তীরবর্তী অধিবাসীদের ত্যাগ ও সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় পাশাপাশি তৎকালীন স্বাধীনতাহীন ভারতবাসীর ত্যাগ স্বীকারেরও ইঙ্গিত রয়েছে। 'শাত্-ইল্-আরব' নদীর তীরে অনেক ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় এই নদীর রং অনেক সময় শহিদের রক্তে রঞ্জিত হয়। 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটি নদীর বাস্তব ঘটনা সমৃদ্ধ কাহিনির পাশাপাশি পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার নির্দেশও বলে দেয়। মানবপ্রেমের কবি নজরুলের অসাধারণ সৃষ্টি 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতা। তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতবাসীর চিত্ত জাগরণে 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটি আলোর পথ দেখিয়েছিল। সেটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্মরণে থাকবে।

খেয়া-পারের তরণী: নজরুল 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় পুরাতন জরাজীর্ণ ও কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কবিতাটিতে 'পাপী' ও 'পুণ্যপথের যাত্রী' এই দুধরনের মানুষের কর্মফলের কথা বলা হয়। কবিতাটি ধর্মীয় ভাবধারায় রচিত। 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটি কী করে ও কেন রচিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ প্রদত্ত তথ্য–

তখন নজরুল ইসলাম আর আমি ৮/এ, টার্নার স্ট্রিটে বাস করছি। কি কারণে জানিনা, আফ্‌জালুল হক সাহেব ঢাকা গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'মোসলেম ভারতে' ছাপানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বেগম মুহম্মদ আজমের (খান বাহাদুর মুহম্মদ আজমের স্ত্রীর) আঁকা একখানা নৌকার ছবি সঙ্গে নিয়ে আসেন। পত্রিকায় ছাপানোর আগে ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তার জন্যে ছবিখানা একদিন বিকালবেলা নজরুল

ইসলামের নিকটে আফ্‌জালুল হক সাহেব রেখে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, নজরুল ইসলাম গদ্যে এই আধ্যাত্মিক ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দিবে। কিন্তু নজরুল তা করল না। সে রাত্রিবেলা প্রথমে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করল এবং তারপরে লিখল এই বিষয়ে তার বিখ্যাত কবিতা 'খেয়া-পারের তরণী'।[৮]

কোরবানি: নজরুল 'কোরবানি' কবিতায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, মনের পশু প্রবৃত্তিকে হত্যা করে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

মোহর্‌রম: নজরুল 'মোহর্‌রম' কবিতায় গভীর শোক ও বেদনার দিক তুলে ধরেন। তিনি শোকের দিকটি চিত্রিত করার পাশাপাশি ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

বহুমাত্রিক নজরুল সৃষ্টির আনন্দে বাংলা সাহিত্যে যুক্ত করেছেন এক আপন মাত্রা। তিনি মানুষকে রাঙিয়েছেন চেতনার রঙে। অবিস্মরণীয় মানব নজরুলের কাব্যসৃজনে পরাধীন অখণ্ড ভারতের নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ খুঁজে পাওয়া যায়। নজরুলের কবি কল্পনার সাথে মানবতাবোধ, দেশের সমকালীন সমস্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় মানবপ্রেমিক রূপে সমাদৃত। তাইতো তিনি অসাম্প্রদায়িক জনগণের চিত্তে বরাবরই বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের সৃষ্টি ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর নজরুলকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ ও আমন্ত্রণে ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ২৪শে মে সম্পূর্ণ সংবিতহারা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তাঁকে নিয়ে আসার পরে জাতির পিতা বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে অভিষিক্ত করেন। নজরুলের সাথে থাকা পুত্রবধূ উমা কাজী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে রাষ্ট্রীয় অতিথি করেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মার পরম আত্মীয় ছিলেন নজরুল। জাতির পিতার শ্রদ্ধার মণি নজরুল। নজরুলকে বঙ্গবন্ধু চিরস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে নিয়ে এসে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছেন।

নজরুলের *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থটি সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে বাঙালির চেতনাসমুদ্রে এক অনন্য শিল্পবিপ্লব। সমাজ বদলের জন্যে নজরুলের জীবনবোধ ছিল অপূর্ব। *অগ্নিবীণা* নজরুলের বিপ্লবী চেতনার অবিনাশী এক প্রেরণা। এর মধ্য দিয়ে নজরুল তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতবাসীর চিত্ত জাগরণে এবং জীবন দিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই *অগ্নিবীণা* নজরুলমানস নিরীক্ষণে শুধু বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, এটি এই ভুবনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।

তথ্যসূত্র

১. প্রীতিকুমার মিত্র, *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস: ভাববিদ্রোহ ও বুদ্ধিসংস্কার*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৫৮;

২. পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১০, পৃ. ৮৯;

৩. মুজফ্‌ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা*, পুথিঘর লি., ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১৪৪-১৪৫;

৪. পারভীন আক্তার জেমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২;

৫. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২;

৬. ভূঁইয়া ইকবাল (সংগ্রহ ও সম্পা.), *নজরুলের কবিতা: বাজেয়াপ্তির জন্য অনুবাদ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ১১;

৭. পারভীন আক্তার জেমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬;

৮. মুজফ্‌ফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য: লেখক ও নজরুল গবেষক, pijushsharmistha@gmail.com

পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ হেল্পলাইন ৩৩৩-৪

পরিবেশ সংক্রান্ত যে-কোনো অভিযোগ জানানোর জন্য জাতীয় তথ্য ও সেবা হেল্পলাইন '৩৩৩-৪' এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত স্মার্ট মন্ত্রণালয় বিনির্মাণ সংক্রান্ত সভায় এই প্রযুক্তিসেবার উদ্বোধন করেন পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে একটি স্মার্ট মন্ত্রণালয়ে পরিণত করা তথা এর সার্বিক ডিজিটাল রূপান্তরে সহযোগিতা ও সমন্বয়কে সহজতর করার জন্য এটুআই, আইসিটি বিভাগ ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং এটুআই'র পক্ষে প্রকল্প পরিচালক মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, এই সমঝোতা স্মারক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে নাগরিকদের অভিযোগ জানানো সুবিধা স্থাপনের পাশাপাশি সরকারি সেবা উন্নত করা, অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্যোগের পরিসরকে বিস্তৃত করবে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা হতে যাচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হবে ১ম স্মার্ট মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, এখন থেকে নাগরিকগণ ৩৩৩ নম্বরে কল করে পরে ৪ চেপে পরিবেশ ছাড়পত্র, গবেষণাগার, বন সংরক্ষণ ইত্যাদি পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন অধিদপ্তরসমূহের তথ্যসেবা ও কর্মকর্তাদের তথ্য পাবেন। পাশাপাশি পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট এবং অবৈধভাবে বন/পাহাড় ধ্বংস ও গাছ কাটা ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন। পরে অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ড্যাশবোর্ডে প্রেরণ করা হবে। এরপর কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সুবিধাভোগীরা এসএমএস-এর মাধ্যমে আপডেট পাবেন অথবা ৩৩৩-তে কল করেও আপডেট জানতে পারবেন।

প্রতিবেদন: সুহৃদ চৌধুরী

প্রাকৃতিক অনন্য সম্পদ সুন্দরবন

উষা রানী রায়

সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি। এটি বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। সুন্দরবন সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধশালী হওয়ায় ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সুন্দরবনকে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্রশস্ত বনভূমিকেই বলা হয় সুন্দরবন। এই বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী; এই বৃক্ষের নামানুসারে সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়– এমন অভিমতই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। বাংলায় সুন্দরবনের আক্ষরিক অর্থ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর বনভূমি। এই বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে অবস্থিত। ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই বন, যার মধ্যে ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে আর বাকি অংশ রয়েছে ভারতে। ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। এটি প্রকৃতির এক অনন্য উপহার।

সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের মোহনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিস্তীর্ণ বন। বাংলাদেশের দক্ষিণের ৩টি জেলা যথা– খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিবেচনায় সুন্দরবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিখ্যাত বিরল প্রজাতির রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই বনের প্রধান আকর্ষণ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, জীববৈচিত্র্যের আধার এই সুন্দরবনে ১২০ প্রজাতির মাছ, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৮টি উভচর প্রজাতির আবাস্থল। সুন্দরবনে রয়েছে বিখ্যাত প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আছে নানা ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির, সাপ, বিভিন্ন ধরনের পাখিসহ অসংখ্য প্রাণী। জরিপ মোতাবেক, ১০৬ বাঘ এবং এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ চিত্রা হরিণ রয়েছে এই সুন্দরবনে। প্রতিবছর হাজার হাজার দেশি-বিদেশি পর্যটক সুন্দরবনে ঘুরতে আসেন। পাখি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ পাঠ ও গবেষণার ক্ষেত্রে পাখি-বিজ্ঞানীদের জন্য সুন্দরবন এক অনন্য উদাহরণ। সুন্দরবন নানা ধরনের পশুপাখির জন্য বিখ্যাত।

সুন্দরবনের বনজ বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুন্দরী বৃক্ষ। এছাড়া রয়েছে গেওয়া, গরান, ধুন্দল ও কেওড়াসহ অনেক রকমের গাছ। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত প্রেইন এর হিসাব মতে, সুন্দরবনে সর্বমোট ২৪৫ শ্রেণির ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। বনবৃক্ষে আচ্ছাদিত সুন্দরী, গেওয়া, গরান, গোলপাতা, কেউড়া, বাইন, গরান, খলসি ইত্যাদি সুন্দরবনের সৌন্দর্য আঁকড়ে রেখেছে। এছাড়া রয়েছে শন, নলখাগড়া এবং গোলপাতা ইত্যাদি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

বনভূমির পাশাপাশি সুন্দরবনের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে নোনা এবং মিঠা পানির জলাধার, আন্তঃস্রোতীয় পলিভূমি, বালুচর, বালিয়াড়ি। বেলে মাটিতে উন্মুক্ত তৃণভূমি এবং গাছ ও গুল্মের এলাকা। সুন্দরবনের প্রত্যেকটি উপাদানেরই রয়েছে অর্থনৈতিক গুরুত্ব। সুন্দরবনের বৃক্ষের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হলো পশুর গাছের কাঠ। সুন্দরবনের মাছ ঐ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের আয়ের একটি বড়ো উৎস, যেখান থেকে কোনো প্রকার বিনিয়োগ ছাড়াই প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। সুন্দরবনে রয়েছে অসংখ্য মৌচাক, যা থেকে প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম সংগ্রহ

করে মৌয়ালরা। প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুন্দরবনের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সুন্দরবন।

অসংখ্য নদীনালা ও খাল জালের মতো জড়িয়ে আছে এই বনের মধ্যে, যা বন প্রকৃতির এক অপরূপ চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর অবদান। সুন্দরবনের বুক চিরে বয়ে চলেছে ৪০০ নদীনালা এবং ২০০ খাল। এসব নদী ও খালে রয়েছে প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে ২০ প্রজাতির চিংড়ি, ৭ প্রজাতির কাঁকড়া, ৬ প্রজাতির ঝিনুকসহ আরও অন্যান্য প্রজাতি।

স্থানীয় জেলেরা বনদেবী বনবিবির প্রার্থনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে যাত্রা শুরুর আগে। সুন্দরবনে নিরাপদ বিচরণের জন্য প্রার্থনা করাও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে জরুরি। বাঘ যেহেতু সবসময় পেছন থেকে আক্রমণ করে সেহেতু জেলে এবং কাঠুরেরা মাথার পেছনে মুখোশ পরে। সরকারি কর্মকর্তারা আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড়দের প্যাডের মতো শক্ত প্যাড পরেন, যা গলার পেছনের অংশ ঢেকে রাখে। এ ব্যবস্থা করা হয় শিরদাঁড়ায় বাঘের কামড় প্রতিরোধ করার জন্য যা তাদের পছন্দের আক্রমণ কৌশল।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস। এই বন কাঠের উপর নির্ভরশীল শিল্পে কাঁচামাল জোগান দেয়। এছাড়াও কাঠ, জ্বালানি ও মণ্ডের মতো প্রথাগত বনজ সম্পদের পাশাপাশি এ বন থেকে নিয়মিত ব্যাপকভাবে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার পাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষপূর্ণ সুন্দরবনের এই ভূমি একই সাথে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড় প্রতিরোধক, উপকূল স্থিতিকারী, শক্তি সম্পদের আধার এবং পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ সুন্দরবন। এখানকার কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, টাইগার পয়েন্টে (কচিখালী) প্রতিবছর পর্যটকদের প্রচুর সমাগম ঘটে। এর অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বন্যপ্রাণী ভ্রমণকারীদের জন্য অতি আকর্ষণীয়। প্রতিবছর এই খাত থেকে বাংলাদেশের আয় কয়েকশো কোটি টাকা।

২০০১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের আওতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রূপান্তর ও পরশের উদ্যোগে এবং দেশের আরো ৭০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে 'সুন্দরবন দিবস' ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন দিবস পালিত হচ্ছে।

এই বন প্রচুর প্রতিরোধমূলক ও উৎপাদনমূলক ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব এর সংরক্ষণমূলক ভূমিকা। এ বন উপকূলভাগের ভূমিক্ষয় রোধ করে, উপকূলীয় এলাকা পুনরুদ্ধার করে এবং নদীবাহিত পলি স্তরীভূত করে। এর মোহনা অঞ্চল বহু ধরনের মাছের প্রজনন কেন্দ্র। সুন্দরবনের বনসম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সুন্দরবন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করে আসছে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জনসংখ্যা ও তাদের সম্পদের প্রাকৃতিক নিরাপত্তালয় হিসেবে সুন্দরবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্গম, শ্বাপদসংকুল, চিত্তাকর্ষক ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সুন্দরবনের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে দারুণভাবে। সুন্দরবন বাংলাদেশের ঐতিহ্য, যা বাংলাদেশকে বিশ্ব বাজারে পরিচিতিও দিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন রক্ষা ও পরিচর্যায় সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও আন্তরিকতা জরুরি। পর্যটকসহ সকলের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্ত কাম্য। এ অনন্য সম্পদ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করুক প্রাকৃতিকভাবেই। সুন্দরবন স্বনামেই তার মহিমা প্রকাশ করুক অবারিতভাবেই। সুন্দরবন হোক সমৃদ্ধ– এই প্রার্থনা করি।

উষা রানী রায়: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

শিশু ক্যানসার রোধে চাই সচেতনতা

শামসুন নাহার

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। মরণব্যাধি ক্যানসারের আক্রমণে অকালে সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় অনেক শিশুকে। প্রতিবছর ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস পালন করা হয়। ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছেই। ওয়ার্ল্ড চাইল্ড ক্যানসারের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে প্রতিবছর ২ লাখ শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেই আক্রান্ত হয় শতকরা ৮০ ভাগ। এখানে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের বেঁচে থাকার হার মাত্র ৫ ভাগ। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোর এই হার ৮০ ভাগ। সংস্থাটির তথ্যমতে, বর্তমানে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রায় ১৩ থেকে ১৫ লাখ ক্যানসারে আক্রান্ত শিশু রয়েছে। ২০০৫ সালে ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ না থাকলেও ক্যানসার সচেতনতা, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুদের জীবন বাঁচানো সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। শিশুদের মূলত জিনগত ত্রুটি ও বিভিন্ন কারণে ক্যানসার হয়ে থাকে। যদিও শিশুদের ক্যানসার বেশির ভাগই জন্মগত। শিশু ক্যানসারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো লিউকোমিয়া। (শিশুদের মধ্যে সব ক্যানসারের এক-তৃতীয়াংশ লিউকোমিয়া) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের টিউমার, মেডেলোব্লাপস্টোমা, নিও-রোব্লোস্টোমা, নেফ্রোব্লাস্টোমা, রেটিনোব্লাস্টোমা ইত্যাদি ক্যানসার নবজাতক শিশু বা একেবারে ছোটো শিশুদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। হজকিন্স, নন হজকিন্স, নিস্ফোমা, বোন টিউমার, বোন ম্যারো ক্যানসার ইত্যাদি ছোটো-বড়ো সব বয়সের শিশুদের হতে পারে। শিশু ক্যানসারের কিছু উপসর্গ বা লক্ষণ রয়েছে। এ উপসর্গগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। লক্ষণগুলো প্রথমেই ধরা পড়লে শিশুটির জীবন রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে শিশুদের ক্যানসারের লক্ষণগুলো দেওয়া হলো–

১. নাক থেকে ঘন ঘন রক্তপাত
২. ক্ষত না সারা
৩. গ্রন্থি (লিম্ফ নোড) ফুলে ওঠা
৪. ওজন কমে যাওয়া
৫. লঘু শ্বাস-প্রশ্বাস
৬. ব্যাখ্যাতীত জ্বর
৭. শরীরে চাকার মতো অনুভব করা
৮. দুর্বলতা
৯. স্বভাবে অভাবনীয় পরিবর্তন
১০. মাথাব্যথা
১১. বমি করা
১২. চোখে দেখতে অসুবিধা
১৩. ফিট বা অচেতন হওয়া
১৪. হাড়ে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা
১৫. মলমূত্র বা বমির সঙ্গে রক্তপাত ইত্যাদি।

উল্লিখিত এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত শিশু বিশেষজ্ঞর কাছে যাওয়া উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা করাতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে ক্যানসার নিরাময় করা সহজ হয়। অসচেতনতা ও অপচিকিৎসা ক্যানসারে শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। শিশু দুর্বলতা বোধ করলে অনেক সময় অভিভাবকরা মনে করেন সে স্কুলে ফাঁকি দিতে চাচ্ছে বা সে অলস। কিন্তু তা নাও হতে পারে। বরং এসব লক্ষণগুলো একটাও দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। শিশুদের সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার যেমন: পালংশাক, ব্রোকলি, ডিমের কুসুম, মটরশুটি, কলিজা, মুরগির মাংস, কচুশাক, কলা, মিষ্টি আলু, কমলা, দুধ, শালগম, বাঁধাকপি, বরবটি, কাঠ বাদামের মতো ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে।

সারা বিশ্বে প্রতি ৩ মিনিটে একটি শিশু ক্যানসারে মারা যায়। যদিও ৮০ শতাংশের বেশি শিশু ক্যানসারের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে এবং মানসম্পন্ন যত্নের সঙ্গে পূর্ণ ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।

শিশু ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০২ সালে চাইল্ড ক্যানসার ইন্টারন্যাশনাল (সিসিআই) কর্তৃক ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস পালন শুরু হয়। সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও এ দিবসটির অন্যতম লক্ষ্য হলো শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং ক্যানসার সম্পর্কিত ব্যাথা ও এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা শিশুদের দুর্দশা হ্রাস করা। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিসিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতিবছর তিন লাখেরও বেশি শিশুর জন্মের ১৯ বছরের মধ্যে ক্যানসার ধরা পড়ে। পেডিয়াট্রিক অনকোলজি ন্যাশনাল ডাটাবেইজ (পিওএনডি) সূত্রে জানা যায়, জিনগত কারণ ছাড়াও নগরায়ণের পরোক্ষ প্রভাবে শিশুদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা বাড়ছে। ভাইরাস দূষণ এবং বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি ক্যানসারের মূল কারণ। সুস্থ ও ক্যানসারমুক্ত প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব নগরায়ণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, অধিকাংশ শিশুর ক্যানসার চিকিৎসা যোগ্য। প্রাপ্তবয়স্ক ক্যানসারের তুলনায় শিশু ক্যানসারের ক্ষেত্রে আরও সফলভাবে চিকিৎসা করা যায়। অসংক্রামক এ রোগের প্রকোপ বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। ভেজাল খাদ্য গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সচেতনতার অভাব, সঠিক তথ্য না জানা ইত্যাদির কারণে এ অসংক্রামক রোগটি বেড়েই চলেছে। ফুটফুটে সুন্দর শিশুদের জীবনাবসান হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে। আশার বাণী হলো, সরকার ইতোমধ্যে দেশের সব বিভাগে ১০০ শয্যার ক্যানসার হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার সহজলভ্যতা বিভাগ পর্যন্ত নিশ্চিত করতে পারলে সারা দেশে লাখ লাখ মানুষ কম খরচে এই সেবা পেতে পারবে। এককালীন আর্থিক অনুদান ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রদান করছে সরকার। বাংলাদেশে এখন ক্যানসারের চিকিৎসা পর্যাপ্ত রয়েছে। তাই শিশুদের ক্যানসার হলে পরিবারকে ভেঙ্গে না পড়ে, দ্রুত তাদের চিকিৎসা করাতে হবে সঠিক উপায়ে। তাহলেই তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

শামসুন নাহার: প্রাবন্ধিক

উন্নত জাতি গঠনে গ্রন্থাগার

জেসিকা হোসেন

গ্রন্থাগার বা প্রকৃত অর্থে পাঠাগার হলো বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর একটি সংগ্রহশালা, যেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে পাঠ, গবেষণা কিংবা তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। বাংলা 'গ্রন্থাগার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে গ্রন্থ+আগার এবং 'পাঠাগার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাঠ+আগার পাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রন্থসজ্জিত পাঠ করার আগার বা স্থান হলো গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলেন গ্রন্থাগারিক।

গ্রন্থাগারের ইতিহাসের শুরু ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঐতিহাসিক যুগের সন্ধিক্ষণে। প্রথম লাইব্রেরিগুলো ছিল লেখার প্রাচীনতম ফর্মের সংরক্ষণাগার- যেমন ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সুমেরে আবিষ্কৃত কিউনিফর্ম লিপিতে মাটির ট্যাবলেট এর সংরক্ষণাগার। নিনেভেতে আশুরবানিপালের লাইব্রেরি থেকে ৩০০০০ টির ও বেশি মাটির ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারের মধ্যে ছিল সৃষ্টির ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য এনুমা ইলিশ, গিলগামেশের মহাকাব্য, এনুমা আনু এনলিল, 'ওমেন টেক্সট'। জ্যোতির্বিদ্যা/জ্যোতিষ সংক্রান্ত পাঠ্য, দ্বিভাষিক শব্দভাণ্ডার, চিকিৎসা নির্ণয়ের তালিকা ও রয়েছে।

তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীব সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব মিলেছে। তিব্বতি সূত্র অনুসারে, নালন্দার গ্রন্থাগারটির নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। তিনটি বহুতলবিশিষ্ট ভবনে এই গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল। ভবনগুলোর নাম ছিল 'রত্নসাগর', 'রত্নোদধি' ও 'রত্নরঞ্জক'। রত্নোদধি ছিল নয়টি তলবিশিষ্ট ভবন। নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারে লক্ষাধিক গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থাগারে ধর্মগ্রন্থের পুঁথি, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, জ্যোতিষবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে গ্রিসে, লিখিত বই দিয়ে তৈরি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি আবির্ভূত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় কনস্টান্টিনোপল এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশ্বের মহান গ্রন্থাগার তৈরি হয়। পৌরাণিক দার্শনিক লাওজি চীনের ইম্পেরিয়াল ঝো রাজবংশের প্রাচীনতম লাইব্রেরিতে বইয়ের রক্ষক ছিলেন। এছাড়াও, ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু প্রাচীন গ্রন্থাগারে পাওয়া ক্যাটালগ লাইব্রেরিয়ানদের উপস্থিতির চিত্র তুলে ধরে। চতুর্দশ শতাব্দীতে, টিম্বাক্টুর গ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন, 'এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছে। বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।'
- ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন– বই, বই এবং বই।'
- ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম বলেন, 'একটি বই একশটি বন্ধুর সমান, কিন্তু একজন ভালো বন্ধু, পুরো একটি লাইব্রেরির সমান।'
- দেকার্তে বলেন, 'ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলা।'
- অস্কার ওয়াইলড বলেন, 'একজন মানুষ ভবিষ্যতে কী হবেন, সেটি অন্য কিছু দিয়ে বোঝা না গেলেও তার পড়া বইয়ের ধরন দেখে, তা অনেকাংশেই বোঝা যায়।'

মনীষীদের এই উক্তিগুলো থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়, উন্নত জাতি গঠনে গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর দেশব্যাপী দিবসটি ২০১৮ সাল থেকে পালন করে আসছে। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য– 'গ্রন্থাগারে বই পড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি'। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রতিবছর ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। দেশের জনগণের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে, দেশব্যাপী এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া গ্রন্থাগার পেশাজীবী এবং সাধারণ পাঠকদের উদ্দীপ্ত করতে এ দিবসটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গ্রন্থাগারবান্ধব সরকার দেশের জনগণকে আরও জ্ঞানমনস্ক করতে গ্রন্থাগারগুলোর সক্ষমতা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করে চলেছেন। এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ছয় জেলায় লাইব্রেরি ভবন তৈরি হয়েছে। চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ, অনলাইনে গণগ্রন্থাগারগুলোর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পরিচালনা, ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিজ আনলিমিটেড শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

গ্রন্থাগারের উৎকর্ষ সাধনে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। প্রযুক্তি যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোর মধ্য গতির সঞ্চার করেছে তেমনি গ্রন্থাগারে প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজগুলোকে সুসংগঠিত করেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে হয়েছে উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং মানুষ সেই নিত্য নতুন আবিষ্কারের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। গ্রন্থাগারও এর ব্যতিক্রম নয়।

জ্ঞান রাজ্যের পিপাসা মেটানোর অন্যতম আতুরঘর গ্রন্থাগার এই প্রযুক্তির বাইরে নয়। গ্রন্থাগারগুলো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির সাথে চলার চেষ্টা করছে। গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সঠিক ব্যবহারকারীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া। এজন্যই গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

বইয়ের থেকেই নতুন প্রজন্ম জানতে পারছে সবকিছু। যে জাতি তার ইতিহাস জানে না, তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। তাই সামনে এগোতে প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, আর ইতিহাসের সেই গল্প লেখা আছে বইয়ে, আর সেই বই সংরক্ষিত আছে গ্রন্থাগারে। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতা শব্দগুলো একইসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে গুরুত্বের সাথে। আমরা জানি, যে জাতির গ্রন্থাগার যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। তাই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে, আমরা সুন্দর আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারব– এই হোক আমাদের সবার প্রত্যাশা।

জেসিকা হোসেন: প্রাবন্ধিক

মেদস্খলন

জসীম আল ফাহিম

ঘুমের ঘোরে মানুষ মাঝেমধ্যে এমন কিছু স্বপ্ন দেখে, যার রেশ ঘুম ভাঙার পরও থেকে যায়। স্বপ্নটির কথা ভেবে শিহরিত হয় মন। বার বার মনে পড়তে থাকে অদ্ভুত স্বপ্নটির কথা।

জোবেদা বেগম আজ তেমনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন। এটি সুস্বপ্ন নাকি দুঃস্বপ্ন ভেবে পাচ্ছেন না। সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পরই তার মনটা কেমন যেন বিরস হয়ে আছে। কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। আচ্ছা, এমন অদ্ভুত স্বপ্নটি না-দেখলে কী তার হতো না। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব! ঘুমন্ত মানুষ তো মৃতেরই মতো। আর তিনি কী তা ইচ্ছে করে দেখেছেন নাকি। চোখ দুটো তো তার বন্ধই ছিল। আসলে স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের অবচেতন মনের কাল্পনিক বহিঃপ্রকাশ।

জোবেদা বেগম তার স্বপ্নটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। একটু ভাবলেই ঘুরেফিরে মনে পড়ে যায়। স্বপ্নটি এমন– অনেক দূরের কোনো একটি অদ্ভুত দেশে গিয়েছেন তিনি। সেই দেশের কোনো একটি মোহনীয় পুষ্প উদ্যানে একাকী হাঁটছেন। গাছে গাছে ফুটে আছে নানান রঙের মনোহারিণী ফুল। রং-বেরঙের পাখপাখালি গাইছে মধুর সুরে গান। এমন সময় কোথা থেকে যেন একপ্রকার উষ্ণ হাওয়া প্রবাহিত হলো। সেই সাথে তার শরীরটা প্রচণ্ড উত্তাপে পুড়ে যাবার উপক্রম হলো। বুঝতে পারলেন তিনি– শরীরটা ঘামছে। ঠিক তখনি উষ্ণ হাওয়ার কুণ্ডলীটি এসে ঘিরে ধরল তাকে। অনুভব করলেন, তিনি যেন একটি ঘূর্ণিবায়ুর কুণ্ডলীতে আটকা পড়ে গেছেন। সহসা একটি মোচড় দিয়ে কুণ্ডলীটি তাকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে গেল। আকাশ এবং ভূমির ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে। সেখানে কিছু নেই। শুধু উষ্ণ হাওয়া আর ধোঁয়া।

এভাবে অনেকক্ষণ শূন্যে ঝুলে থাকার পর তিনি বুঝলেন, হঠাৎ থেমে গেছে উষ্ণ হাওয়ার ঘূর্ণাবর্ত। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন উষ্ণ হাওয়ার নির্মম দাপাদাপি। যদিও বাতাস কখনো দৃষ্টিগোচর নয়। তবু তিনি বাতাসকে নিজ চোখে দেখে রীতিমতো অবাক হলেন। যখন বাতাস থেমে গেল তাকে আর শূন্যে ধরে রাখে কে? ধপাস করে পড়ে গেলেন তিনি সেই বাগানে। ঠিক তখনি তার ঘুমটা গেল ভেঙে। তিনি ততক্ষণে নিজেকে আবিষ্কার করলেন বেডরুমের বিছানায়। আচমকা শিহরিত হলেন তিনি। এমন অদ্ভুত স্বপ্নও কেউ কখনো দেখে নাকি!

জোবেদা বেগমের স্বামী জনাব ফজলুল হক। বিশিষ্ট শরীর চর্চাবিদ। জেলা পর্যায়ের চাকুরে তিনি। দীর্ঘাকায় দেহ, পেশীবহুল শরীর। মাথার সম্মুখভাগটা পুরোপুরি টাকের দখলে। গোঁফ আছে, তবে বিছা পোকার মতো নয়। হিটলারের মতো নাকের নীচে বিশেষ আদলে রাখা। বলা যায় 'হিটলারি মুছ'। দাঁত বড়ো বড়ো হওয়ায় মনে হয় সবসময় বুঝি তিনি হাসি দিয়েই রয়েছেন। এমনিতেই তিনি কথা বলেন খুব কম। তবে শরীর চর্চা বিষয়ে যখন লেকচার শুরু করে দেন, তখন টেপরেকর্ডারও হার মানতে বাধ্য।

সেদিক থেকে জোবেদা বেগম সম্পূর্ণ আলাদা। মোটা-তাজা ফুটবল মার্কা শরীর। শরীরে দীর্ঘদিন ধরে চর্বি জমে জমে একেবারে যেন ব্রয়লারের মুরগি। তার ওপর বদরাগী স্বভাব। সবসময় কেমন যেন খেপে থাকেন বেচারি। তার চোখে চোখে চেয়ে দু-কথা বলার দুঃসাহস ইহকালে হয়ে উঠেনি হক সাহেবের। তাই তিনি পরকালে শোধ নেবার জন্য ধৈর্য ধারণ করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, জোবেদা বেগমের কাছে হক সাহেব যেন রীতিমতো একটা ক্ষোভের পাত্র। কথায় কথায়, কাজে-অকাজে তিনি হক সাহেবের সাথে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করেন। বেচারা হক সাহেব নিরুপায়। দজ্জাল বউকে শাসন করার সবরকম ক্ষমতাই যেন এতদিনে তিনি খুইয়েছেন।

জোবেদা বেগমের জলহস্তি মার্কা শরীরটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য হক সাহেব প্রায়ই বলেন। নানাভাবে বুঝান। মোটা-তাজা শরীরের নাম স্বাস্থ্য নয়। সুস্থ থাকার নামই স্বাস্থ্য। স্বাভাবিক শরীর নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার নামই স্বাস্থ্য। তাই বলি, মাঝেমধ্যে ব্যায়াম-ট্যায়াম করো। দশটার বদলে ভোর ছ-টায় ঘুম থেকে জাগো। জেগে দেখো কী সুন্দর প্রভাত! বিশুদ্ধ বাতাসে বুকভরে প্রাণখুলে নিশ্বাস নাও। সকালবেলা হাঁটাহাঁটি করো। হাঁটাহাঁটি করাটাও স্বাস্থ্যকর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। জোবেদা বেগম পালটা লাগান ধমক। তোমার লেকচার বন্ধ করো তো। ওসব শুনে শুনে আমার দু-কান ঝালাপালা। নতুন কিছু থাকলে বলো। নইলে চুপ করে থাকো।

হক সাহেব বুঝেন বউকে বুঝানো মুশকিল। তবু বার বার চেষ্টা করে যান। তোমার ওই মোটা শরীরের জন্য খুব শীঘ্র তুমি হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা, এমনকি ডায়াবেটিসেও আক্রান্ত হতে পারো। তখন আমার কথাগুলো ঠিকই মনে পড়বে তোমার।

হক সাহেবের পরামর্শ শুনে জোবেদা বেগম গর্জে উঠে বলেন, শোনো– আমার শরীর নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজে যে-শুকিয়ে শুকিয়ে শুটকি মাছ হচ্ছো, সেদিকে খেয়াল আছে? আমারটা দেখে খুব বুঝি হিংসে হয়, না...? আমি ঐ হিংসের চোখে কাঁটা ফুটে দেবো দেখো একদিন।

বউয়ের কথা শুনে হক সাহেব কিছু বলেন না। শুধু নীরব হয়ে থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি নীরব শ্রোতা। এভাবে জোবেদা বেগম কিছুক্ষণ চ্যাঁচিয়ে অগ্নিমেজাজ পানি করে নেন। এটা তার রুটিন বাঁধা অভ্যেস। ওসব হক সাহেবের জানা ব্যাপার। তাই তিনি জোবেদা বেগমকে একটু সুযোগ করে দেন মেজাজ ঝাড়ার জন্য।

অফিসে, অফিসের বাইরে সবাই হক সাহেবকে সমীহ করে কথা বলেন। হক সাহেবের মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা দেখায় না-কেউ। অথচ জোবেদা বেগম যখন তখন যে-ভাবে খুশি কথায় কথায় লোকটাকে অপমান করেন। বেচারা হক সাহেবও নীরবে তা হজম করেন। কী করবেন!

হক সাহেবের মনে পড়ে যায়। ইউনিভার্সিটি জীবনে খুব নামি ছাত্র ছিলেন তিনি। তার জীবনে ফার্স্ট হওয়া ছাড়া সেকেন্ড হবার কোনো রেকর্ড নেই। জোবেদা বেগম মাত্র অনার্সে এসে ভর্তি হয়েছেন। হক সাহেব তখন এমএসসিতে পড়েন। ডিবেটিং ক্লাবে প্রথম পরিচয় হয় দুজনার। একটু-আধটু কথা বলা, বন্ধুত্ব, ভালো লাগা থেকে কালক্রমে সম্পর্কটা প্রণয়-পরিণতি পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। জোবেদা বেগম কোনো আহামরি সুন্দরী ছিলেন না। তবে মেধাবী যে-ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডিবেটিংয়ে তিনি বরাবরই ফার্স্ট হতেন। ডিবেটিংয়ের সেই অভিজ্ঞতাই তিনি আজকাল চর্চা করে যাচ্ছেন হক সাহেবের সংসারে। নিরুপায় হক সাহেব সবকিছুই নীরবে সয়ে যান।

আজ যা ঘটল, তা ইতঃপূর্বে ঘটেছে কিনা হক সাহেবের জানা নেই। তাই আনন্দে তাকে একদম কচি খোকার মতো আচরণ করতে দেখা গেল। জোবেদা বেগম হক সাহেবকে স্বপ্নের ঘটনাটি খুলে বলেছেন। আর তাতেই তার এমন অবস্থা।

হক সাহেব একই সোফায় বিজয়ীর বেশে স্ত্রীর গা ঘেঁষে বসেন। জোবেদা বেগমের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, কোনো চিন্তা করো না-বউ। বিকেলে আমি তোমাকে একজন স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাব। খুলে বলব সব। দেখি তিনি কী বলেন।

শুনে জোবেদা বেগম সহসা বজ্রের মতো কড়াৎ করে উঠলেন। হক সাহেব নেংটি ইঁদুরের মতো মুখে কাঁচুমাচু ভাব এনে সরে পড়লেন। জোবেদা বেগম চ্যাঁচিয়ে বলেন– তুমি যাবে মানে? হ্যাঁ! পেয়েছোটা কী, শুনি। স্বপ্ন দেখলাম আমি। প্রবলেমটা আমার। যেতে হয় যাব আমি। তুমি বড়োজোর আমার সঙ্গে যেতে পারো।

জোবেদা বেগমের কণ্ঠে নমনীয়তা আঁচ করতে পারেন হক সাহেব। পরে তিনি বলেন, না-বউ থাক। তুমিই বরং যাও।

এদিকে গোপনে হক সাহেব গেলেন শহরের নামিদামি স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞের কাছে। স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞ তার বন্ধু মানুষ। ছাত্রজীবনের কোনো একটা পর্বে একসাথে পড়াশোনা করেছেন। কী করতে হবে স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞকে তিনি বুঝিয়ে বলে এলেন। পরে তার কাছ থেকে একটি টিকেট নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

জোবেদা বেগম টিকেট নিয়ে বিকেলে একাই গেলেন স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞের কাছে। বিশেষজ্ঞকে খুলে বললেন স্বপ্নের ঘটনা। বিশেষজ্ঞ খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন জোবেদা বেগমের ঘটনাবলি। শুনে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে ম্যাডাম! আমাদের শাস্ত্রমতে বললে সেটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তা আপনার সাথে আর কেউ কী এসেছে? মানে পুরুষ মানুষ। আপনার স্বামী।

জোবেদা বেগমের চোখমুখে ফ্যাকাশে ভাব লক্ষ করা গেল। ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন, কেউ তো আসেনি। কী করতে হবে আমাকেই খুলে বলুন। কোনো সমস্যা নেই।

বিশেষজ্ঞ একটু সময় নিয়ে বললেন, অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে। এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কিছু করারও নেই। কারণ যা নির্ধারিত হবার তা হয়ে গেছে। এখন শুধু আফসোস করা ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই।

জোবেদা বেগম একটু সংশয় নিয়ে বলেন, বিশেষজ্ঞ সাহেব– আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। প্লিজ, বিষয়টা একটু বিস্তারিত বলুন।

জোবেদা বেগম আসলে একটি সাধারণ স্বপ্নই দেখেছিলেন। এটি নিয়ে এতটা ভরকে যাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু হক সাহেবের নির্দেশ সাধারণকে একটু অসাধারণ করে বলা। বিশেষজ্ঞ সাহেব কী তা অমান্য করতে পারেন? হাজার হলেও ছাত্রজীবনের বন্ধু। তাই তিনি বললেন, আপনার আয়ু আছে আর মাত্র চল্লিশ দিন। যা ইচ্ছে হয় এরই মধ্যে সেরে ফেলুন। সময় খুব অল্প।

স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞের কথা শুনে জোবেদা বেগমের চিত্তজুড়ে ভয়ের শীতল বাতাস বয়ে গেল। এক অদ্ভুত নিস্তেজতা আর নির্জীবতা নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

এদিকে অধীর আগ্রহ নিয়ে চৈত্র মাসের চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছিলেন হক সাহেব। জোবেদা বেগমের কাছে তিনি জানতে চাইলেন বিশেষজ্ঞ তাকে কী বলল।

কিন্তু জোবেদা বেগমের মুখে কোনো কথা ফুটল না। চোখমুখে কেমন যেন হতাশা আর ক্লান্তির ছাপ। হক সাহেব বললেন, কী হয়েছে বউ। আমাকে সব খুলে বলো তো। শুনে দেখি কী করা যায়।

জোবেদা বেগম বললেন, তোমাকে বলে কোনো লাভ নেই। লন্ডনে ফোন লাগাও। সেলিমকে খবর দাও। ও যেন খুব শীঘ্রই বাড়ি ফেরে।

সেলিম হচ্ছে হক সাহেব এবং জোবেদা বেগমের একমাত্র সন্তান। লন্ডনের একটি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। হক সাহেব অধীর আগ্রহ নিয়ে স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন। বউ, বিশেষজ্ঞ সাহেব তোমাকে কী বললেন তা তো আমাকে জানালে না। তিনি এমন কী কথা বললেন যার জন্য তুমি লন্ডন থেকে ছেলেকে বাড়ি আনাতে চাচ্ছো। আমাকে খুলে বলো তো সব।

জোবেদা বেগমকে একটু নমনীয় হতে দেখা গেল। তারপর বিশেষজ্ঞ সাহেব যা বললেন হক সাহেবকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে হক সাহেব মনে মনে বললেন, যাক! শেষপর্যন্ত গিন্নিকে জব্দ করা গেল। গিন্নির মনে মৃত্যুভয় তবে ঢুকেছে! এবার পাগল সোজা পথে না-হেঁটে যাবে কোথায়?

মৃত্যু জিনিসটা সবারই কাম্য। তা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক। জন্মের সার্থকতা তো মৃত্যু দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমরা সবাই তা জেনেও না-জানার ভান করি। গিন্নিকে এমনভাবে জব্দ করতে পেরে বহুদিন পর হক সাহেব মনে মনে পুলকিত হলেন। তারপর মুখে একটু সমবেদনার ছাপ এনে বউকে বললেন, সবকিছু লীলাখেলা বউ। বুঝা বড়ো দায়! হাসিমুখে মেনে নাও। নইলে তিনি আবার বেজার হবেন।

লন্ডনে ছেলের কাছে ফোন দিলেন হক সাহেব। সেলিম প্রথমে ভরকে গিয়েছিল। না-জানি আবার সিরিয়াস কিছু একটা ঘটে গেছে। পরে হক সাহেব ছেলেকে ব্যাপার বুঝিয়ে বললে সেলিম বুঝতে পারে। হক সাহেব সেলিমকে বললেন, শোন বাবা। এ ব্যাপারে তোর আম্মুও তোকে ফোন করতে পারে। কিন্তু সাবধান! এসব কিছু ওকে বলতে যাস্‌নে। তুই শুধু বলিস খুব শীঘ্রই বাড়ি আসছিস। কিন্তু বাড়ি আসছিস না-মোটেও। মনে থাকে যেন। আর তোর আম্মুর শরীরের মেদ কমে স্বাভাবিক হয়ে গেলে আমি তোকে জানাব। তখনি কেবল তুই বাড়ি ফিরবি।

ছেলেকে ম্যানেজ করে হক সাহেব জোবেদা বেগমকে বললেন, বলল তো সেলিম আসছে। খুব শীঘ্রই নাকি আসছে।

স্বামীর কথা শুনে জোবেদা বেগম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

হক সাহেব স্ত্রীকে আদরমাখা সুরে বলেন, শোনো বউ, মন যা চায় তাড়াতাড়ি আমাকে বলো। আমি তোমাকে সব এনে দেবো। সব এনে খাওয়াব। তুমি চাও তো আকাশের চাঁদটাকেও নামিয়ে আনব তোমার কাছে। এনে তোমাকে খেতে দেবো।

অন্য সময় হলে স্বামীর এরূপ কথায় দারুণ চটে যেতেন জোবেদা বেগম। বলতেন, চাঁদ এনে দেবে, মানে কি? চাঁদটা কী তোমার বাপ-দাদার সম্পত্তি নাকি, যে তুমি চাইলেই ওকে হাতে ছুঁতে পারবে! বেকুবের মতো কথা বলো! এমন কথা আর কোনোদিন বলবে না। যাও, এখন সামনে থেকে।

কিন্তু দেখা গেল, ওসবের কিছুই তিনি বললেন না। এমনকি রাগলেনও না। হয়তো তিনি ভাবছেন, মরে যখন যাবই তখন শুধু শুধু আর লোকটাকে বকে কী লাভ! ভালোই ভালোই মরতে পারলেই ভালো হয়।

স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিলেন জোবেদা বেগম আজ এক সপ্তাহ পার হলো। দিন দিন কেমন যেন গম্ভীর ভাব ফুটে উঠছে তার চোখমুখে, চলন-বলনে। খাবার-দাবার থেকে তার রুচি পুরোপুরি উঠে গেছে। আজকাল ভাত-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি। শুধু রাতে একবেলা শুকনো রুটি আর একটু দুধ খেয়ে শুয়ে থাকেন। ওসব হক সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করেন আর মনে মনে হাসেন।

আশ্চর্যরকমভাবে মৃত্যুভয়টা বাসা বেঁধে ফেলেছে জোবেদা বেগমের মনে। যদিও মৃত্যু কামনা করাটাই ছিল স্বাভাবিক। মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি তা পারছেন না। কীভাবে এত সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে তিনি যাবেন! এত সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে গিয়ে একদিন তাকে থাকতে হবে সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে। সে এক অন্ধকার জগৎ! পৃথিবীর সাথে নেই যার কোনো যোগাযোগ। কতদিন থাকতে হয়, কে জানে! সাদা কাফনের কথা, কাঠের কফিনের কথা, মনে হলেই চোখ বেয়ে জল ঝরে তার।

জোবেদা বেগম ভাবেন, আহা! যদি আরও কয়েকটি বছর বেঁচে থাকতে পারতেন! তবে সেলিমকে বিয়ে দিয়ে ঘরটাকে আলো করে হাসিমুখে বিদায় নিতে পারতেন। কিন্তু মানুষের সব আশা পূর্ণতার দ্বারে পৌঁছায় না। জোবেদা বেগমের গুলোও পৌঁছাবে না। তার মৃত্যুর পর সব আশা হাহাকার করে বেড়াবে পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে। ভেবে ভেবে আনমনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

তারপর একদিন দেখা গেল বিশেষজ্ঞের বেঁধে দেওয়া চল্লিশটি দিন পার হয়ে গেছে। এভাবে আরও কয়েক দিন পেরিয়ে যাবার পর জোবেদা বেগমের বিশ্বাসে টনক নড়ল। তিনি আসলে মরছেন না। মরে যাবেনও না।

ততদিনে জোবেদা বেগমের শরীরের মেদ ঝরে গিয়ে তিনি পুরোপুরি স্লিম হয়ে গেছেন। তিনি যেন একদম ষোড়শী তরুণী হয়ে গেছেন। আচার-ব্যবহারেও মার্জিত ভাব ফিরে এসেছে। তবে শরীর খুব দুর্বল। মাথায় কেমন যেন ঝিমধরা ঝিমধরা ভাব। ঠিকমতো চলতে ফিরতে পারেন না।

এমন শরীর নিয়ে একদিন রিকশা করে হক সাহেবের বাঁ পাশে বসে তিনি গিয়ে হাজির হলেন স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞের চেম্বারে।

জোবেদা বেগমকে দেখে বিশেষজ্ঞ সাহেব রীতিমতো হকচকিয়ে উঠলেন। এ কী দেখছেন তিনি! ভূত না-তো! অবশ্য হক সাহেবকে সঙ্গে দেখে আশ্বস্ত হলেন। জোবেদা বেগম স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বিশেষজ্ঞ সাহেব। আপনার ধারণা পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হলো। সেদিন আপনি বলেছিলেন, আমি আর মাত্র চল্লিশ দিন বেঁচে থাকব। কিন্তু দেখুন, চল্লিশ পেরিয়ে পঁয়তাল্লিশেও দিব্যি বেঁচে আছি।

জোবেদা বেগমের কথা শুনে বিশেষজ্ঞ সাহেব সহসা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। হাসতে হাসতেই তিনি বলেন, ভাবি সাহেব। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি পুরোপুরি ঠিকই ছিলেন। শুধু মেদটা ছিল অসম্ভব রকমের বেশি। ওই যে-স্বপ্নটা দেখেছিলেন, ওটা ছিল আপনার অবচেতন মনের ওপর কল্পনার একধরনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। মেদ ঝরে গেছে। এখন আপনার আর কোনো চিন্তা নেই। শরীর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তাছাড়া আপনার সাহেব যদি এমনটি না-চাইতেন তো...বলে তিনি আগের মতো গলা ফাটিয়ে আরেক দফা হেসে নিলেন।

বিশেষজ্ঞ সাহেবের কথা শুনে জোবেদা বেগমের বুঝতে আর বাকি রইল না-যে হক সাহেবের ইশারাতেই এমনটি হয়েছে। তিনি হক সাহেবের পানে একবার তাকালেন। নিয়ম মতো সে চোখে অগ্নি ঝরার কথা। মুখ ফসকে বের হবার কথা ভয়াবহ অ্যাটম বোম্ব জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু না, জোবেদা বেগম হক সাহেবকে তেমন কোনো কিছুই বললেন না। হক সাহেবের দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে শুধু একবার হাসলেন।

সেই চোখে, সে হাসিতে হক সাহেব কী দেখলেন, কী বুঝলেন কে জানে! হয়তো তিনি খুঁজে পেলেন বহু যুগের সঞ্চিত ভালোবাসা আর আবেগময়ীর সুপ্ত প্রাণের মৌন প্রকাশ। সেই ভালোবাসার আবেগে সিক্ত হয়ে আচমকা উঁকি দিয়েছিল তারও চোখের কোণে উষ্ণ আনন্দাশ্রু। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির সামনে তার উৎসারণ ঠিক নয় ভেবে স্ত্রীর হাত ধরে তিনি হনহন করে বেরিয়ে আসেন।

-০-

রাষ্ট্রভাষা বাংলা

আবুল হোসেন আজাদ

দখিনা হাওয়ার মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ ভোরে
মুয়াজ্জিনের আজানের সুরেলা কণ্ঠ
পাখিদের কলকণ্ঠে ঘুম ভেঙে দেখি
পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার শাখা
রক্ত লাল ফুলে ফুলে।

পথে জনস্রোত নগ্ন পায়ে হাতে ব্যানার-ফেস্টুন
অ আ ক খ বর্ণমালার কালজয়ী ভাষার গান–
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি।

বেলা বেড়ে যায় শহিদমিনার
ভরে ওঠে ফুলের তোড়ার স্তূপে
অগণন মানুষের শ্রদ্ধায় ভালোবাসায়
স্মৃতির অ্যালবামে সেঁটে থাকে
শহিদ সজনের প্রতিচ্ছবি
রফিক সালাম বরকত জব্বার শফিক।

পাকিস্তানি শাসক চক্রের বৈষম্যে
বাংলা আমার মাতৃভাষা নির্বাসিত যখন
বাহান্নর সেই একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্নে
ঢাকার রাজপথ ভিজে গেল ভাইয়ের রক্তে
ওদের আত্মত্যাগে–
আমরা পেলাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

মায়ের ভাষা

রুহুল গনি জ্যোতি

যেই ভাষাটা আমার ভাইয়ের রক্ত দিয়ে লেখা
যেই ভাষাটা মায়ের মুখে শুনতে শুনতে শেখা
সেই তো আমার মায়ের ভাষা সবার সেরা দান
এই ভাষাতে কথা বলে জুড়ায় আমার প্রাণ।
হাজার ভাষার এই পৃথিবী হাজার রকম বুলি
মনের কথা আমরা সবাই মায়ের ভাষায় বলি
মায়ের ভাষা সবার প্রিয় তাই তার সম্মান
সমুন্নত রাখতে গাইছি মায়ের ভাষার গান।
কারও মায়ের মুখের ভাষা কেউ নেবে না কেড়ে
মায়ের ভাষার শিক্ষা নিয়ে উঠুক সবাই বেড়ে
একুশ শেখায় সবার মায়ের ভাষা একই সমান
মায়ের ভাষার প্রতি তাদের একই রকম টান।

'বাংলা' আমার কী যে

অজিতা মিত্র

দেশের নামই 'বাংলা' আমার,
'বাংলা' মায়ের ভাষা।
হৃদয়জুড়ে 'বাংলা' আমার,
'বাংলা' ভালোবাসা।

তাকিয়ে দেখো চোখের তারায়, হাত রাখো এই হাতে,
বাংলা– শুধুই লাল-সবুজের 'বাংলা' পাবে তাতে।
'বাংলা' নামে রক্ত আমার চনমনিয়ে ওঠে,
প্রাণের কথা ছলছলিয়ে 'বাংলা' হয়ে ফোটে।

নদীর তানে, পাখির গানে 'বাংলা' মিশে আছে;
ধানের ক্ষেতে 'বাংলা' দেখো, 'বাংলা' মাটির কাছে।
'বাংলা' আমার নকশিকাঁথা, তাঁতের ডুরে শাড়ি,
মেঠোপথের শেষ বাঁকে এই 'বাংলা' আমার বাড়ি।

'বাংলা' আমার চুলের ফিতে, আলতা, সিঁদুর, চুড়ি;
'বাংলা' হলো আমার ছেলের লাল, সাদা, নীল ঘুড়ি।
আমার হাতের পুলিপিঠেয়, ইলিশ মাছের ঝোলে
'বাংলা' পাবে; আরও পাবে ময়না পাখির বোলে!

তালগাছেরা দিঘির জলে এই যে ফেলে ছায়া,
সেটাও আমার সবুজ শ্যামল 'বাংলা' মায়ের মায়া!
ওই যে দেখো পুঁটির ঝাঁকে কী অপরূপ খেলা!
রাত্তিরে ঠিক এই দিঘিতে বসবে তারার মেলা!

'বাংলা' দেখবে চলো, জাংলাভরা 'বাংলা' আছে ধরে,
লাউয়ের পাশে শিমের থোকা দুলছে কেমন করে!
পানের বরজ মানেই হলো, 'বাংলা' আছে মিশে,
আর দেখাবো, ঘরের ভেতর 'বাংলা' আছে কীসে!

আমার হাতের পাটের সিকে, এই যে মাটির চুলো,
কাঠের পিড়ি, বাঁশের ঝুড়ি, চালনি, ডালা, কুলো;
কোনটা রেখে কোনটা দেখাই, এই দেখো না ধামা,
মাটির ঘরে ঘুঙুর পায়ে দিচ্ছে খুকি হামা।

'বাংলা' আহা 'বাংলা' আমার; 'বাংলা' কোথায় নেই?
এই যে আমি, এই যে তুমি, 'বাংলা' হলো এই।
গল্প আমার ফুরোবে না, বিষয় যখন দেশ,
যায় না জানা কোথায় শুরু 'বাংলা' কোথায় শেষ!

'বাংলা' আমার ...
'বাংলা' আমার ...
'বাংলা' আমার কী যে!
'বাংলা' আমার কী, জানি না ...
'বাংলা' আমি নিজে!

বইমেলা

বেগম শামসুন নাহার

মনে করিয়ে দেয় ফেব্রুয়ারির বইমেলা
বাহান্নর অমর একুশের বেলা
বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় সাটা
আমার ভায়ের রক্ত দানের কথা
শহিদের রক্তে রঞ্জিত ভালোবাসার সেই রাজপথ
বছর ঘুরে এ মাসেই আসে আমার প্রাঙ্গণে
লিখে যাই আমি অ, আ, ঈ, ক, ম তাদের স্মরণে
সেই প্রভাতফেরির কথা, মৌন মিছিলের কথা,
কালো পতাকার কথা,

বার বার গেয়ে চলি সেই অমর গীতি–
'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি'।

বইমেলা প্রাণের মেলা
এক সাথে শত প্রাণ মিলে- বিনম্র চিত্তে
শ্রদ্ধা জানাই সেই সব ভাষা শহিদের প্রতি
নতুন বছরে হরেক রকম বই

বন্ধু-স্বজন, গুণিজন, লেখক-লেখিকার মেলবন্ধন
কখনও সেলফি তোলা, কখনও অটোগ্রাফ নেওয়া
ভালো লাগা বই কেনা বই পড়া, মেধার বিকাশ,
শিশুর কোমল হাতের ছোঁয়ায়–

অমর একুশের রক্তে রাঙা বইমেলা
বাঙালির প্রাণের মেলা।

ফাল্গুনে

আলমগীর কবির

এত রং পেলো কই ফুলকুঁড়ি ঠোঁটে?
ফুলের সুবাস পেয়ে মৌমাছি জোটে।

প্রজাপতি দল বেঁধে ফুলবনে আসে,
ডালে ডালে এত ফুল প্রাণ খুলে হাসে।
এত গান এত সুর পাখি ডাকা ভোরে,
ভোর হেসে ভালোবেসে বাঁধে মায়া ডোরে।

ডালে ডালে আম-লিচু-জামের মুকুল,
সবুজের রঙে রাঙা নদীর দু'কূল।

মাঠজুড়ে শোভা পায় কচি ধান চারা,
হাওয়াতে খায় দোল ছবি প্রাণ কাড়া।

এত হাসি এত খুশি চাষিদের মুখে,
শান্তির ধারা যেন বয়ে যায় বুকে।

মাঠজুড়ে নেই আজ সবুজের শেষ,
ফাল্গুনে সেজে উঠে প্রাণপ্রিয় দেশ।

মায়ের চোখে ফেব্রুয়ারি

সপ্তিকা চক্রবর্তী

বহমান সেই অশ্রুধারা দাগ টেনে ছিল চোখে,
আরও কত প্রাণ কেঁদেছিল মায়ের আর্তনাদ দেখে।
দিন মাস আর কেটেছে বছর জীবনের পাতা থেকে,
হারানোর সেই দীর্ঘশ্বাসে তীর বেঁধে ছিল বুকে।
ভাই-বোন আত্মীয় ভুলেছিল ব্যথা সময়ের হাত ধরে,
মায়ের সম্মুখে ভাসে আজও ছবি, খোকা আছে কত দূরে?
সাজানো আলমারি আঁচলে মুছে, যেথা পোশাকের সারি,
চলে গিয়েছিল খোকা যে মায়ের একুশে ফেব্রুয়ারি।
নাম না জানা অগণিত সেই শহিদের ভিড়ে হায়,
আদরের সেই খোকা যে মায়ের কোথায় হারিয়ে যায়?
আগলে রাখা কত না স্মৃতি হয় না গো সেদিনের মতো,
ক্যালেন্ডারের উল্টানো পাতায় কত বছর হয়েছে গত।
শোকেতে কাতর জননী চলার, শক্তি নাই যে আর,
বলে শুধু আহা! খোকার দেখা পাই যদি একবার।
ভাবছে মনে বাড়ির উঠানে ডাকে বুঝি খোকা তার,
মাগো আমি তোমার কোলেতে, ফিরেছি আজকে আবার।
খোকা খালি পায়ে ছেঁড়া জামা গায়ে বন্দুক কাঁধে তোলা,
শুধু স্বপ্নেই আসে মায়েরই পাশে, খুশিতে আত্মভোলা।
সান্ত্বনা প্রাণে দেশের কারণে খোকা তার হলো দান,
করবে স্মরণ বেঁচে আছে মাগো, কোটি কোটি সন্তান।
আজও এই মাসে ভাষার দিবসে লোকে লোক সারি সারি,
ফুলে ফুলে সাজে প্রতি প্রাণে বাজে একুশে ফেব্রুয়ারি।

রক্তে লেখা গান

রিয়াজ মাহমুদ রাতুল

ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি, রক্তে লেখা গান
বীর শহিদের আত্মদানের অমর প্রতিদান।
এই মাসেতে ভাই হারালাম মাতৃভাষার জন্য
সালাম, রফিক প্রাণের দামে হয়ে আছে ধন্য।

ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি, রক্তে লেখা গান
এই মাসেতে কৃষ্ণচূড়া ছড়ায় শোকের ঘ্রাণ!
এই মাসেতে বুলেট বিঁধে আমার ভায়ের বুকে,
তাইতো মোরা বাংলা ভাষায় বলছি কথা সুখে।

ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি, রক্তে লেখা গান
বছর ঘুরে মাসটা এলেই মন করে আনচান!
হারিয়ে যাই খুব অতলে ইতিহাসের পাতায়,
ইচ্ছেমতো লিখতে থাকি 'অ আ ক খ' খাতায়।
ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি, রক্তে লেখা গান
ফেব্রুয়ারি মানেই হলো ভাষার উপাখ্যান।
ফেব্রুয়ারি মানে হলো বাংলাতে গান গাওয়া,
প্রাণের দামে মাতৃভাষা বাংলা তবে পাওয়া।
ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি, রক্তে লেখা গান
ফেব্রুয়ারি মানে হলো শিখা অনির্বাণ।
ফেব্রুয়ারি মানে হলো বাংলাতে মা ডাকা।
স্মৃতির পাতায়, মনের খাতায় ইচ্ছেমতো আঁকা।

বেঁচে থাকো বর্ণমালা

হাসান হাফিজ

বর্ণমালা, তোমার ভেতরে শুধু ফুল নয়
অগ্নিও যে বিদ্যমান, তুমি যে বারুদ
বাহান্ন প্রবল সত্যে সে সাহস দেখিয়েছে,
বিশ্ববাসী পেয়েছে মায়ের স্নেহ অনন্য সে ওম
যথোচিত মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়েছে।
ভাষা হলো নদীমাতা, ভাষা হলো প্রাণ
একুশে তোমার দীপ্তি চিরঞ্জীব ঐকতান
বাহান্নে ফুটেছে সেই রক্তফুল
স্বৈরাচার পদানত, গুনেছে মাশুল।

বর্ণমালা, জলহাওয়া রোদের মতোই তুমি স্বাভাবিক
ছন্দে গানে পৃথিবীর মাতৃভাষা সব
ফুল্ল হোক প্রতিদিনই পরিপূর্ণ হোক
যে তাকে আঘাত করে, ধ্বংসে লিপ্ত হয়
প্রকৃতি নিশ্চিত করে তার পরাজয়
নিন্দিত সে পাষণ্ড প্রতীক
বর্ণমালা, বেঁচে থাকো সঞ্জীবনী অক্সিজেন হও
তুমি অস্তিত্বেরই অংশ, অনাত্মীয় নও।

স্বর্গ এলো নামি

সোহানা আকতার

সরষের ক্ষেতে
সোনা রঙ মেতে
স্বর্গ এলো নামি,
সুখের দোলায় দোলে
কানায় কানায় ফুলে
পূর্ণ অন্তর্যামী।

সবুজে সবুজে
মোহনীয় রূপ যে
লতায় লতায় প্রীত,
হলদে পরীর
মায়াবি নীড়
ফুলে ফুলে গীত।

যতদূর যায় দৃষ্টি
অপার মহিমা সৃষ্টি
হলুদ মায়ার কানন,
ছবির মনমোহন
জুড়ায় প্রাণমন
জোছনায় রাত্রি যাপন।

পৃথিবীর দেশে দেশে
মনের হরষে
এমন সুখ পাবে না আর,
পাহাড়ে পর্বতে
সমুদ্র সৈকতে
শুধুই রূপের সমাহার।

একুশ আমার

মুহাম্মদ ইসমাঈল

একুশ আমার রক্তে কেনা
শত ভাইয়ের দান
একুশ আমার মায়ের মুখে
শিশুর শোনা গান।

একুশ আমার মায়ের কান্না
বোনের যত স্মৃতি
একুশ আমার ভাইয়ের আদর
ছোটোবেলার প্রীতি।

একুশ আমার প্রাণের ত্যাগে
ফিরিয়ে পাওয়া ভাষা
একুশ আমার বাংলা ভাষায়
ব্যক্ত করা আশা।

একুশ আমার ভাষার দাবি
বাহান্নরই ফাগুন
একুশ আমার দীপ্ত ভাষণ
বর্ণমালার আগুন।

একুশের স্মৃতিতে বরকত

আপন চৌধুরী

ঘুমিয়ে আছে শহিদ বরকত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।
বেঁচে আছে কোটি বাঙালির
হৃদয়ের গহীন অঙ্গনে।
২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে
মিছিল করতে গিয়ে শহিদ হয়েছে।
মাতৃভাষার জন্য দিয়েছে প্রাণ
নিজেরে করেছে বলিদান।
ছিল না তাঁর কোনো অনুশোচনা
ভাষার জন্য বরকত দিয়েছে প্রেরণা।
কোটি মানুষের মনে ছিল আশা
বাংলা হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৩০শে জানুয়ারি ২০২৪ জাতীয় সংসদে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন– পিআইডি

একুশে বইমেলা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিকাশের অন্যতম অনুষঙ্গ

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, অমর একুশে বইমেলা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিকাশে একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। ১লা ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন উপলক্ষে ৩১শে জানুয়ারি দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন।

মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, অমর একুশে বইমেলা বাঙালির প্রাণের মেলা। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমি আয়োজিত এ বইমেলা লেখক-পাঠক-সংস্কৃতি কর্মীসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে এক অনন্য মিলনমেলা।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলা একাডেমি বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ হিসেবে মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা পালন করছে।

মোঃ সাহাবুদ্দিন আশা প্রকাশ করেন, ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। বাঙালির প্রাণের এই মেলা বই কেনার পাশাপাশি আলোচনাসভা, সংগীতানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবে সংস্কৃতির অমিয় সুধা।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে বইমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। অমর একুশে বইমেলা মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে দায়িত্ব পালনের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারি দেওয়া বাণীতে এ আহ্বান জানান তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। দিনটি আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষিত ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ছয় দফা ঘোষণার পর স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয় এবং সারা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ মতিউরসহ অন্যান্য শহিদদের রক্ত বৃথা যায়নি। গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ রাজবন্দিদের মুক্তি এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের একটি মাইলফলক। গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরেই আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে অর্জিত এই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০শে জানুয়ারি ২০২৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগ 'বাংলাদেশের সাথে বায়োব্যাংকিং: রোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরোধে একটি যৌথ পদ্ধতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ভিডিও বার্তা প্রদান করেন– পিআইডি

অনুবাদের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশনার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক মঞ্চে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি মুদ্রিত বইগুলোর ডিজিটাল প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমি সকল প্রকাশককে মুদ্রণ প্রকাশনার পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যাতে আমরা আমাদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্ব মঞ্চেও দ্রুত পৌঁছে দিতে পারি। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে রেকর্ড ২১তম বারের মতো মাসব্যাপী 'অমর একুশে বইমেলা ২০২৪'-এর উদ্বোধনকালে দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এখন আমাদের যুগটা হয়ে গেছে আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ, এই যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত। তিনি বলেন, বইয়ের প্রকাশনা থাকবে কারণ একটি বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টে পড়ার মধ্যে একটি আলাদা আনন্দ আছে। তবে, আজকালকার যুগে ছেলেমেয়েরা আবার ট্যাবে করে বই পড়ে, আবার, ল্যাপটপ বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের সাহায্যে বই পড়ে। যদিও আমরা তাতে মজা পাই না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বাংলা সাহিত্য যত বেশি অনুবাদ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীরা পড়ার সুযোগ পাবে। সেখানে আমি আরেকটা কথা বলব, যে এখানে বাংলা একাডেমি একটি আলাদা ওয়েব পোর্টাল তৈরি করে যত প্রকাশনা হয় সেগুলো ডিজিটালাইজড করে সেটা প্রচার করা এবং অন্যান্য ভাষার যাতে অনুবাদ হয় সে ব্যবস্থাটা করতে পারলে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আরও দ্রুত বিশ্বব্যাপী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। সে ব্যবস্থাটা আমাদের করা দরকার।

এসময় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা: দ্বিতীয় খণ্ড* এবং *প্রাণের মেলায় শেখ হাসিনা* (বাংলা একাডেমিতে শেখ হাসিনার গত ২০ বারের ভাষণের সংকলন) শীর্ষক দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৬ জনকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করেন।

জাতীয় বায়োব্যাংকের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে মেডিকেল ও লাইফ সাইন্সের অন্যান্য শাখার উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্য একটি বিশ্বমানের জাতীয় বায়োব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আসুন আমরা এই বায়োব্যাংককে বাস্তবে পরিণত করতে একসঙ্গে কাজ করি। এ বায়োব্যাংক আশাবাদের প্রতীক– যা আমাদের একটি উন্নত ও স্বাস্থ্যকর বিশ্বের দিকে পরিচালিত করবে। ৩০শে জানুয়ারি ২০২৪ বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের সঙ্গে বায়োব্যাংকিং: রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে একটি যৌথ পদ্ধতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে সম্প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (বিএসএমএমইউ), ব্রাসেলসে বাংলাদেশের দূতাবাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জাতীয় বায়োব্যাংক প্রতিষ্ঠার একটি ভিত্তি তৈরি করা। একটি বায়োব্যাংককে সাধারণত মানব জৈবিক নমুনা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি পদ্ধতিগত উপায়ে সংগঠিত সংশ্লিষ্ট তথ্যের সংগ্রহশালা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

গোলটেবিলে অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সাথে একটি সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতা

এবং বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের কোটি কোটি নাগরিকের মঙ্গল ও কল্যাণ জোরদার করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় আমরা এখানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে গবেষণা সক্ষমতার উন্নয়নের জন্য একটি বিশ্বমানের বায়োব্যাংক তৈরি করা জরুরি। বায়োব্যাংক চিকিৎসা ও জীবন বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে সহায়তা করবে। তিনি আশা করেন, এটি রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং ব্যক্তিগত যত্নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারে। তিনি বলেন, এই বায়োব্যাংকের অবদান শুধুমাত্র একটি আর্থিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি মানবিক কাজ। এটি বিশ্বের একটি আশার প্রতীক। সেখানে প্রত্যেকের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

তৈরি পোশাক খাতের মতো অন্যান্য রপ্তানি পণ্যকেও গুরুত্ব দিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈদেশিক আয় বাড়াতে তৈরি পোশাকের মতো পাট ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য এবং হস্তশিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্যে একই গুরুত্ব দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের আরও নতুন পণ্য উৎপাদন এবং নতুন বাজার (রপ্তানির জন্য) অন্বেষণে মনোযোগ দিতে হবে। আমরা বর্তমানে রপ্তানির জন্য কয়েকটি পণ্যের উপর নির্ভর করি। রপ্তানির জন্য একটি বা দুটি পণ্যের উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ অনেক প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ২১শে জানুয়ারি রাজধানীর উপকণ্ঠে পূর্বাচল নিউ টাউনে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে মাসব্যাপী ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সারা বাংলাদেশে তাঁর সরকারের একশো অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হবে এবং কোন অঞ্চলে কোন পণ্য ভালো হয় সেখানে সেই শিল্প গড়ে উঠবে। সেবা খাতেও আমাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভালো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এই খাতে রপ্তানি আয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছে এবং আইসিটি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার বিশাল সুযোগ সামনে রয়ে গেছে। আইটি খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত রপ্তানি আয় ২৭ দশমিক ৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ দেশে পণ্যের চাহিদা মিটিয়ে আমরা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারছি।

এছাড়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সাথে পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে সরকার জাতীয় 'ট্যারিফ পলিসি ২০২৩' প্রণয়ন করছে। এটা আমাদের রপ্তানিতে আরও সুযোগ সুবিধা এনে দেবে। এ সময় পাটের 'জেনোম সিকোয়েন্সিং' এবং বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদার উল্লেখ করে তিনি চামড়া সংরক্ষণ ও বহুমুখীকরণ করে চামড়া রপ্তানির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদনঃ প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ঃ বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্র সার্বক্ষণিক চলছে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির প্রেতাত্মারা এখনো দেশের আনাচেকানাচে অনেক জায়গায় আছে। তারা ঘাপটি মেরে থাকে, লুকিয়ে থাকে। সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দেয়। আবারও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্তরাত্মায় তারা আঘাত করতে চায়। তাদের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ৩১শে জানুয়ারি রাজধানীর মিরপুরে মিরপুর হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযোদ্ধাদের হাত ধরে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে না পড়লে এ দেশকে আমরা হানাদারমুক্ত করতে পারতাম না। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এখনো আমাদের দাসত্ব করতে হতো এবং আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এদেশের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে এত সহজে এ দেশ, এ স্বাধীনতা আমরা পাইনি। অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ, অনেক কিছুর পর আমরা এ দেশ পেয়েছি। এ অনুধাবন যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা এদেশের স্বাধীনতাকে এত সহজে অন্য কারো হাতে হরণ করতে দেব না।

তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যা করা হয়। তারপর যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করা হয়েছিল তার বিপরীত দিকে দেশকে পরিচালনা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে আবার দেশের দখল নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি। এ ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক সজাগ থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ যুগেও আমাদের একেক জনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তৈরি হতে হবে। যে-কোনো পরিস্থিতিতে, যে-কোনো বাস্তবতায় দেশের শত্রুর বিপক্ষে যাতে শক্তভাবে আমরা দাঁড়াতে পারি, দেশের স্বাধীনতার পক্ষে, অগ্রগতির পক্ষে শক্তভাবে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি সে প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শক্তিশালী নেতৃত্ব না থাকলে অনেকের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে এ দেশের শান্তি বিনষ্ট হতো। তাঁর কারণেই আমরা সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবিলা করে দেশের শান্তি বজায় রাখতে পেরেছি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আছেন বলেই দেশের এই শান্তি-সমৃদ্ধি

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত রাজধানীর মিরপুরে ৩১শে জানুয়ারি ২০২৪ মিরপুর হানাদারমুক্ত দিবসে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আছেন বলেই দেশে শান্তি বিরাজ করছে, সমৃদ্ধি ঘটছে। ১৫ই জানুয়ারি তার নির্বাচনি এলাকা ঢাকা ১৭ আসনের কালাচাঁদপুর সরকারি হাইস্কুল এবং কলেজ মাঠে তার সম্মানে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের জায়গায় জায়গায় অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র আমরা টেলিভিশনে দেখি, খবরের পাতায় পড়ি। আমাদের দেশে গত ১৫ বছর ধরে শান্তি আছে, দেশ এগিয়ে চলেছে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

একইসাথে সতর্কবার্তা দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানুষের শান্তি বিনষ্টের জন্য যারা মানুষ ও যানবাহনের ওপর পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে, এমনকি ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করে নির্মমভাবে নারী-শিশুসহ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে, তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদেরকে রুখে দিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সন্ত্রাসীদের দেখানো ভয়ভীতিতে মানুষ আতঙ্কিত হয়নি। শীতের সকালে ভোট দিতে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা জরিপ করে দেখেছি, যে-কোনো নির্বাচনি এলাকার ২৪ থেকে ২৫ শতাংশ ভোটার এলাকায় থাকেন না। অর্থাৎ বাকি ৭৫ শতাংশের মধ্যে হিসাব করলে সারা দেশে গড়ে ৪২ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি ভোট পড়েছে। এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এলাকার জনগণকে ধন্যবাদ জানান ও সুচারু দায়িত্বপালনে তাদের আশীর্বাদ কামনা করেন। ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. জাকির হোসেন বাবুলের সভাপতিত্বে ঢাকা ১১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ওয়াকিল উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

গুজব ও অসত্য প্রচারণার মূলোৎপাটন করতে হবে

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, গুজব ও অসত্য প্রচারণার মূলোৎপাটন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা হবে। ১২ই জানুয়ারি রাজধানীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। আগামী দিনে কী চ্যালেঞ্জ থাকছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামীতে দু'ধরনের চ্যালেঞ্জ। বৈদেশিক যে ষড়যন্ত্রগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কিছু লোকজনের সাথে যুক্ত হয়ে করা হয় এবং দেশের বিরুদ্ধে যে ডিজ-ইনফরমেশন ক্যাম্পিং হচ্ছে সেগুলো আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজ-ইনফরমেশন বা অসত্য প্রচারণায় সৃষ্ট 'গ্যাপ' এবং গুজবের ক্যাম্পিংয়ের উৎস একটা একটা করে খুঁজে বের করে সবাই একসঙ্গে এগুলো সমূলে উৎপাটন করব এবং বিশ্বের সামনে আমরা সত্য কথাগুলো নিয়ে আসব।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

তিনটি পণ্যের জিআই স্বীকৃতির সনদ হস্তান্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) সম্প্রতি টাঙ্গাইলের শাড়ি, নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লার জিআই স্বীকৃতির গেজেট প্রকাশ করে। এ তিনটি জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির সনদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ও সচিব জাকিয়া সুলতানা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রী পরিষদের সভার শুরুতে এই তিনটি পণ্যের জিআই সনদ সরকারপ্রধানের হাতে তুলে দেন।

সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ ৩ ধাপ এগিয়েছে

বিশ্বে ২০২৪ সালের সামরিক শক্তির বিচারে ১৪৫ দেশের মধ্যে ৩৭তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে এ অবস্থান ছিল ৪০তম। সেই হিসেবে এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ডটকমের সর্বশেষ সূচকে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। গত ৬ই জানুয়ারি বিশ্বের ১৪৫টি দেশের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে এই তালিকা প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ডটকম।

কোনো দেশের সশস্ত্রবাহিনীর আকার, অর্থনৈতিক অবস্থা, লজিস্টিক সক্ষমতা ও ভৌগোলিক অবস্থানের মতো ৬০টির বেশি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তাঁর কার্যালয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নকশা ও ট্রেডমার্ক বিভাগ কর্তৃক টাঙ্গাইলের শাড়ি, নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লার জিআই সনদ হস্তান্তর করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন– পিআইডি

বিষয় বিশ্লেষণ করে এই সূচক তৈরি করা হয়। সূচকে যে দেশের স্কোর যত কম থাকে, সামরিক সক্ষমতার তালিকায় সেই দেশ তত এগিয়ে থাকে। এবারের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর শূন্য দশমিক ৫৪১৯। সবচেয়ে কম শূন্য দশমিক ০৬৯৯ স্কোর নিয়ে তালিকার প্রথমে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শীর্ষ দশের তালিকায় এর পরে রয়েছে যথাক্রমে রাশিয়া, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ইতালি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সামরিক শক্তিমত্তার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে সক্রিয় সেনা রয়েছেন আনুমানিক এক লাখ ৬০ হাজার। সেনাবাহিনীতে ট্যাংকের সংখ্যা ৩২০টি। সামরিক যান রয়েছে ১৩ হাজার ১০০টি। নৌবাহিনীর সক্রিয় সদস্য রয়েছেন ২৫ হাজার ১০০ জন। এ বাহিনীর জাহাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রিগেট সাতটি, করভেট ছয়টি, সাবমেরিন দুটি, টহল নৌযান ৩০টি এবং মাইন ওয়ারফেয়ার রয়েছে পাঁচটি। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা ১৭ হাজার ৪০০ জন। এ বাহিনীর মোট উড়োজাহাজের সংখ্যা ২১৬টি। এর মধ্যে যুদ্ধবিমান ৪৪টি, হেলিকপ্টার ৭৩টি, পরিবহণ বিমান ১৬টি ও প্রশিক্ষণ বিমান ৮৫টি। বিশেষ অভিযানের জন্য রয়েছে চারটি যুদ্ধবিমান।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ফ্রিল্যান্সিংয়ে দেশের আয় ১.০৯ বিলিয়ন ডলার

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ফ্রিল্যান্সিং খাতে বাংলাদেশ বর্তমানে ১ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৫ বছরে এ খাতে আয় ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। ২১শে জানুয়ারি রাজশাহীতে প্রধান অতিথি হিসেবে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। রাজশাহী সিটি করপোরেশন এমপ্লয়মেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম ও ল্যাব পরিদর্শন এবং নগর ভবনের সিটি হলরুমে রাসিকের কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, ফ্রিল্যান্সিং বাংলাদেশে ভবিষ্যতে বিদেশি মুদ্রা আয়ের বড়ো খাত হবে। রাজশাহীতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এমপ্লয়মেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগামীতে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এখানে তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করে অর্থ আয় করতে পারবে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ফ্রিল্যান্সিং করে ডলার আয় এবং স্মার্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত হবে রাজশাহী।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আরসিসি এমপ্লয়মেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছি। এটি অনেক ভালো একটি উদ্যোগ। এই মডেলটি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। স্মার্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন ভাই রাজশাহীকে সারা দেশের মধ্যে সেরা ও মডেল শহরে পরিণত করেছেন। সারা বাংলাদেশ তাকে অনুসরণ করছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট হাইটেক পার্ক দাবি করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে হাইটেক পার্ক করে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে স্মার্ট হবে দেশ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দক্ষতার সঙ্গে প্রযুক্তির সম্মিলনে স্মার্ট হবে দেশ। আর এক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী ২৫শে জানুয়ারি সকালে সিংড়ার চলনবিল স্মার্ট সিটিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'হার পাওয়ার' প্রকল্পের আওতায় নাটোর, জয়পুরহাট ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় অংশগ্রহকারী ৫৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মোস্তফা কামাল।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ছাড়াও তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ

জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করছেন, প্রযুক্তির সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরি করে দিচ্ছেন। নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উদ্ভাবনী সৃজনশীল স্মার্ট দেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট দেশ গড়তে প্রত্যেক জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের ১৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ৩০০ শেখ রাসেল স্মার্ট স্কুল গঠন করা হয়েছে। আরও ১০ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের ৫৫৫টি উপজেলায় জয় এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন দেশের মেধাবী তরুণেরা

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন দেশের মেধাবী তরুণেরা। তাদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর জোর দিতে হবে। ৩রা ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট দক্ষিণাচরণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হার পাওয়ার প্রকল্পের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

হার পওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী ফ্রিল্যান্সিংকে অগ্রাধিকার দিয়ে ৪৩টি জেলার সদর উপজেলার মোট ৩টি উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাসহ মোট ১৩০টি উপজেলায় তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চারটি ক্যাটাগরিতে ২৫ হাজার ১২৫ জন নারীকে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া সকল সফল প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে ল্যাপটপ প্রদান করা হবে। বর্তমানে ১৩০টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৪০৮টি ব্যাচে ৮ হাজার ৪৬০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পরে তিনি হার পাওয়ার প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মাধবপুর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নারী ফ্রিল্যান্সার ও নারী কল সেন্টার এজেন্ট ক্যাটাগরির মোট ২৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ল্যাপটপ প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা বিশাল

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী বলেন, স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা বিশাল। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্তহীন প্রয়াস বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উত্তরণে ব্যাপক অবদান রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত স্মার্ট নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। ২৯শে জানুয়ারি ২০২৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে প্রথমবারের মতো তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আসেন। তিনি দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ। এর আগে প্রতিমন্ত্রী দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর ৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন।

শিক্ষকদের ইনহাউস প্রশিক্ষণের নির্দেশ

অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে এ বছর থেকে শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন। এজন্য সব স্কুলে শিক্ষকদের ইনহাউস প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্ব-উদ্যোগে ইনহাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে স্কুলগুলোকে। এদিকে শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ক্লাস চলছে কি না, তা-ও মনিটর করতে বলা হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের। ৯ই জানুয়ারি ২০২৪ এ নির্দেশ দিয়ে আদেশ জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর।

আদেশে বলা হয়েছে, নতুন কারিকুলাম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানপ্রধান তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্ব-উদ্যোগে ইনহাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন করবেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানপ্রধান তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের নেওয়া প্রশিক্ষণ অনুযায়ী শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কি না, তা মনিটর করবেন।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। গত বছরের ১৭ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইআইআইএন-ধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

‘পদ্মশ্রী’ পদকে ভূষিত হলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

বরেণ্য রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘পদ্মশ্রী’ পদকে ভূষিত করা হয়েছে। ২৫শে জানুয়ারি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম ঘোষণা করা হয়। ‘পদ্মশ্রী’ পুরস্কার ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারগুলোর মধ্যে একটি। ‘পদ্মবিভূষণ’, ‘পদ্মভূষণ’ এবং ‘পদ্মশ্রী’ নামে তিনটি বিভাগে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই বছর ১৩২জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ‘পদ্ম’ সম্মাননার জন্য মনোনীত করেছেন। মার্চ বা এপ্রিলে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি এই পুরস্কার প্রদান করবেন।

বন্যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার ও প্রসারে বন্যা একজন প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ২০১৬ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার-স্বাধীনতা দিবস পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। বন্যা ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চাচা আব্দুল আলীর কাছ থেকে তার প্রাথমিক গানের পাঠ গ্রহণ করেন, পরবর্তীতে ঢাকার ছায়ানট, বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) -এ গানের তালিম অব্যাহত থাকে। পরে তিনি ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস’ (আইসসিআর) থেকে শান্তি-নিকেতনের সংগীত ভবনে পড়ার জন্য বৃত্তি পান এবং বিশ্ব ভারতী থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। ২০২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্র সংগীতের ওপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কোকা-কোলায় প্রথম বাংলাদেশি নারী এমডি

শীর্ষস্থানীয় পানীয় কোম্পানি কোকা-কোলা বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হয়েছেন জু-উন নাহার চৌধুরী। প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম নারী হিসেবে তিনি কোম্পানিটির এমডির দায়িত্ব পেলেন। ২২শে জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোকা-কোলা বাংলাদেশ এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জু-উন নাহার চৌধুরী বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার বাংলাদেশের বিপণন বিভাগের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পদে তিনি কাজ করেছেন। তার নেতৃত্বে দেশব্যাপী ‘লাইফবয় হাত ধোয়া প্রচারণা’ আয়োজন করা হয়, যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা পায়।

২০১৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় রেকিট বেনকিজারে যোগদানের মাধ্যমে দেশের বাইরে জু-উন নাহার চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু হয়। সেখানে তিনি ডেটলের ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। পরে ডানোন ইন্দোনেশিয়ার হেড অব ইনোভেশন হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি একমার্সের এফএমসিজি পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০২৩ সালে দেশে ফিরে তিনি অ্যাপেক্সের বিপণন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে সর্বশেষ কোকা-কোলা বাংলাদেশের এমডি হলেন।

বাংলাদেশে নারীদের কাজে যোগ দেওয়া বেড়েছে

মহামারি পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার ২৯.২ শতাংশ থেকে ৪২.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ‘আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিশ্ব কর্মসংস্থান ও সামাজিক আভাস প্রবণতা ২০২৪’ শীর্ষক সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সব শ্রেণির মানুষের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার প্রাক- মহামারি পর্যায়ে একই হারে ফেরত যাবে না বরং এক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকবে। তবে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পৌটিয়াইনেন বলেন, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ হ্রাস এবং শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণে নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নারীদের জন্য নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে তাহলো নারী, তরুণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতার উন্নয়ন করে তাদের শ্রমবাজারে সমানভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

হস্তশিল্পকে বর্ষপণ্য ঘোষণা

দেশের হস্তশিল্পকে ২০২৪ সালের বর্ষপণ্য ঘোষণা করেছে সরকার। ২১শে জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে আশা প্রকাশ করে সরকারপ্রধান বলেন, বাড়িতে ও সমাজে তাদের একটা জায়গা (অবস্থান) তৈরি হবে। নারীদের কর্মসংস্থান করে দেওয়ার জন্য আমি এবার এই ২০২৪ সালে হস্তশিল্পকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করছি।

একক এই বাণিজ্য নির্ভরতা থেকে বের হয়ে পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে কয়েক বছর ধরেই ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী দিনে সম্ভাবনা বিবেচনায়

একেকটি পণ্যকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এবারের বর্ষপণ্য ঘিরে সফলতার স্বপ্ন দেখছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।

বাণিজ্য মেলায় নজর কাড়ছে দেশি পণ্য

রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে (বিবিসিএফইসি) ২১শে জানুয়ারি শুরু হয়েছে ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। উদ্বোধনের পর ওয়ালটনসহ কয়েকটি স্টল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি 'মেড ইন বাংলাদেশ' খ্যাত ওয়ালটনের পণ্যসামগ্রী দেখেন। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ, স্মার্ট ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, টেলিভিশন, লিফট ও এনার্জি সেভিং হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ওয়ালটন বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য তৈরি করছে জেনে প্রধানমন্ত্রী ওয়ালটন পরিবারকে শুভেচ্ছা জানান এবং উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওয়ালটন কী কী পণ্য তৈরি করছে সবই আমার জানা আছে। প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনে ওয়ালটন তথা বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। এ সময় পণ্য রপ্তানি এবং বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতার বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। এই বিষয়ে সরকারের নীতি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। মেলায় এক ছাদের নীচে স্মার্ট ফ্রিজ, এসি, টিভি, লিফট, ওয়াশিং মেশিন, ল্যাপটপসহ অসংখ্য ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

বিমানকে যাত্রীদের আস্থার পরিবহণে পরিণত করতে হবে

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে বিমানবন্দরে সেবারমান আরও বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব আয় বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান। ২২শে জানুয়ারি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এভিয়েশন শিল্পের বাজার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত বাজারের সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় আরও বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং তা নিশ্চিতে সকলকে কাজ করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তাদের রাজস্ব আয় থেকেই তাদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও সম্পন্ন করতে পারে সেই সক্ষমতা অর্জনে মনোযোগ দিতে হবে। তিনি বলেন, বিমানবন্দরভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাইজড করতে হবে যাতে মানুষ সহজে সেবা পায় এবং তাদের দুর্ভোগ কমে আসে।

এসময় তিনি আরও বলেন, বিমানকে যাত্রীদের আস্থার পরিবহণে পরিণত করতে সেবাবৃদ্ধির পাশাপাশি যাত্রীদের সাথেও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লাভের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি লিডারশিপে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় এগিয়েছে

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মন্ত্রণালয়ের যতগুলো প্রকল্প আছে সেগুলোর কাজ সম্পন্ন করব। নতুন প্রকল্প নেব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নেব না। চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশ ডেভেলপিং কান্ট্রি। প্রতিমন্ত্রী ২৩শে জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে বিশেষ উন্নয়ন সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় আজকে অনন্য উচ্চতায় চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি লিডারশিপে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় অনেক এগিয়ে গেছে। তিনি আমাদের ভিশন দিয়েছেন। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের আপগ্রেডেশন করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বন্দর 'পায়রা বন্দর' নির্মাণ হচ্ছে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বদ্বীপ পরিকল্পনা দিয়েছেন। নদীর নাব্যতা রক্ষায় কাজ হচ্ছে। মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন মেরিন একাডেমি এবং মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষকদের সঙ্গে উঠান বৈঠক শুরু কৃষিমন্ত্রীর

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুস শহীদ ২৭শে জানুয়ারি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের কৃষক ইন্দু ভূষণ পাল নিরুর উঠানে পাঁচ শতাধিক কৃষকের উপস্থিতিতে উঠান বৈঠক করেন। কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর কৃষকদের সঙ্গে সারা দেশে উঠান বৈঠক করার কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দান করলেন তার নিজ জেলায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে আমন ধান কাটার পর এই গ্রামের জমি পতিত পড়ে আছে কেন, কীভাবে তা চাষের আওতায় আনা যাবে, কোন জমিতে কী ফসল ফলানো যাবে, সে বিষয়ে আগামী ৫০ দিনের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্থানীয় কৃষি বিভাগকে নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, চাষযোগ্য জমি অনেক। এখন বোরোর মৌসুম, অথচ আমন ধান কাটার পর এখানে সব জমি পতিত পড়ে আছে। এসব জমিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সেচের সমস্যা নিরসনে বিএডিসিকে কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। শ্রমিক সংকট নিরসনে ভর্তুকি মূল্যে আরও বেশি করে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

উঠান বৈঠক প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কৃষকদের সঙ্গে উঠান বৈঠক করে স্থানীয় পর্যায়ে কী কী সমস্যা আছে, তা জেনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে লক্ষ্য– এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবে না, তা অর্জন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করব ও দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত করব। কৃষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা আরও বেশি করে ফসল ফলান। সরকার আপনাদের পাশে আছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তারা আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা দেওয়া হবে। উৎপাদন আরও বাড়াতে পারলে কারও পেটে ক্ষুধা থাকবে না, খাদ্য আমদানি করতে হবে না, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হবে না।

কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ যাবতীয় কৃষিপণ্যের সময়ে-সময়ে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা রোধে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কৃষি সচিবকে এই কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে বিবাদীদের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে আদালত। কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন স্থলে কেন বাজার ব্যবস্থাপনা করা হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। ২৭শে জানুয়ারি বিচারপতি মোস্তফা জামান উসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয়।

পিরোজপুরের আমন চালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম

পিরোজপুর জেলায় এবার আমন চালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। চলতি বছরে আমন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯শত ৩১ মে. টন নির্ধারণ করা হলেও উৎপাদন হয়েছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫শত ৭ মে. টন যা, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮ হাজার ৫৭৬ মে. টন বেশি।

পিরোজপুরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২০২৪ খরিপ-২ মৌসুমে হাইব্রিড, উফশী, স্থানীয় রোপা, স্থানীয় বোনা আমন মিলিয়ে ৬৫ হাজার ৬শত ১৪ হেক্টরে চূড়ান্ত চাষ হয়। ধান কর্তন এবং মাড়াই শেষে হাইব্রিড ৬৪৩ হেক্টরে চাল উৎপাদন হয় ২ হাজার ৩ শত ৬৮ মে. টন। অনুরূপভাবে ১৩ হাজার ৩ শত ১৩ হেক্টরে উফশী চাষ করে চাল পাওয়া গেছে ৩৭ হাজার ২০৩ মে. টন। স্থানীয় জাতের আমন ৪৯ হাজার ৮০৩ হেক্টরে চাষ করে চাল উৎপাদন হয়েছে ৯৫ হাজার ৬১৭ মে. টন। রোপা এবং বোনা আমন ১৮৫৫ হেক্টরে চাষ করে চাল পাওয়া গেছে ২ হাজার ৩১৯ মে. টন।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ড. নজরুল ইসলাম সিকদার জানান, কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ায় এবং সহজলভ্য হওয়ায়, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের উপদেশ অনুযায়ী কৃষকরা ব্যবস্থা নেওয়ায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা

বায়ুদূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাট বেবিসহ পরিবেশ সুশাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। 'সুস্থ পরিবেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ' স্লোগানে ১০০ কর্মদিবসের কর্মসূচি ঘোষণা করেন পরিবেশ, বন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ২৫শে জানুয়ারি ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'সুস্থ পরিবেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে ১০০ কর্মদিবসের অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। মন্ত্রী ২৫শে জানুয়ারি সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দূষণ রোধে এই কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই কর্মপরিকল্পনা মাধ্যমে বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের কর্মকাণ্ডের একটি শক্তিশালী সূচনাসহ পুরো মেয়াদে কাজ করার একটি কাঠামো তৈরি করবে। ১০০ কর্মদিবসে অগ্রাধিকার ঘোষণা করেন সচিব ড. ফারহিনা। মন্ত্রী বলেন, আমরা সার্বিকভাবে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। পরিবেশ বিপর্যয় আমাদের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ঢাকা বায়ুদূষণে প্রথমদিকে থাকে। পাশাপাশি পানি, প্লাস্টিক ও শব্দদূষণ ঘটছে। এর মধ্যে পরিবেশ ও বন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জলবায়ু আমাদের হাতে নেই।

তিনি বলেন, আমরা মানুষের সঙ্গে সৎ হতে চাই। তাই শুরুতেই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে নিচ্ছি। জবাবদিহিতার জায়গা নিশ্চিত করতে চাই তাই এই কর্মসূচি ঘোষণা করছি। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, জনবল ও প্রশিক্ষণ কাঠামো ঠিক করতে চাই। দূষণ নিয়ন্ত্রণে আমরা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ-এর সঙ্গে সমন্বয় করছি। এছাড়াও যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষক কাজ করছেন তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হবে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ইটভাটা ম্যাপিং করা হবে ও দূষণ বের করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, ইটভাটার মাধ্যমে ১৩ কোটি মেট্রিক টন কৃষিজমি হারাচ্ছি। বর্তমানে মাটি পুড়িয়ে ২৫০ কোটি ইট তৈরি হচ্ছে আর ৩০০ কোটি টন পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট তৈরি হচ্ছে। ২০২৮ সালের মধ্যে পুরোপুরি ব্লক ইটে চলে যাব। এর আগে ২০২৪ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা ছিল। প্রাথমিকভাবে ৫০০ ইটভাটা বন্ধ করা হবে যাতে এর মধ্যে ব্লক ইটের উৎপাদন বাড়ে। ২০২৬ সালের মধ্যে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার ৯০ ভাগ কমানো হবে। এছাড়াও তিন মাসের মধ্যে ইপিআর ও ইটিপি নির্ধারণ করা হবে।

রাজধানীর রোল মডেল হবে মুগদা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, পরিচ্ছন্নতার দিক বিবেচনায় মুগদা থানাকে রাজধানীর রোল মডেল করা হবে। ২৬শে জানুয়ারি রাজধানীর মান্ডা হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এলাকার শীতার্তদের মধ্যে ৩ হাজার কম্বল বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি এ সময় সঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং বর্জ্যমুক্ত দেশ গড়ার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, পরিচ্ছন্ন দেশ গড়তে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১০০ দিনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। দেশের জনগণ সরকারের উদ্যোগের সঙ্গে একযোগে কাজ করলে বর্জ্যমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা-৯ আসনের প্রতিটি এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনার বিষয়েও জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা বায়ুদূষণ কমানো নয়, তিনি মান্ডার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্লাস্টিকমুক্ত করার ঘোষণাও দেন।

অনলাইনে মিলবে সাফারি পার্কের টিকিট

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জনগণ যাতে ঝামেলামুক্ত কক্সবাজার ও গাজীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে প্রবেশ করতে পারে, এ জন্য অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, সাফারি পার্কের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে। ২৮শে জানুয়ারি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি। সভায় মন্ত্রী প্রকল্পের বাস্তবায়নে সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিবেদিত প্রাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

বছর ঘুরে আবারও এল ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ২০শে জানুয়ারি পর্দা উঠে উৎসবের দ্বাবিংশতম আসরের। ৯ দিনব্যাপী এই উৎসবে বাংলাদেশসহ ৭৪টি দেশের ২৫০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে বাইরের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ১২৯টি, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও স্বাধীন চলচ্চিত্র ১২৩টি; বাংলাদেশের চলচ্চিত্র রয়েছে ৭১টি।

১৯৯২ সাল থেকে 'নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ'-এই স্লোগান নিয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে আসছে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি। চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে ঢাকার জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা ও

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিনামূল্যে দেশি ও বিদেশি সিনেমা উপভোগ করেন দর্শকরা।

উৎসবে ১০টি বিভাগে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো হলো– এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগ, রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগ, ট্রিবিউট, বাংলাদেশ প্যানোরোমা, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলড্রেন্স ফিল্ম, স্পিরিচুয়াল ফিল্মস, শর্ট অ্যান্ড ইনডিপেনডেন্ট ফিল্ম এবং উইমেন্স ফিল্ম বিভাগ।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ মাস্টার ক্লাস। মাস্টার ক্লাস নেন ইরানি সিনেমার অন্যতম নামি ব্যক্তিত্ব *চিলড্রেন অব হেভেন, বারান* এবং *সং অব স্প্যারোর* মতো বিশ্বনন্দিত সিনেমার পরিচালক মাজিদ মাজিদি। এছাড়া মাস্টার ক্লাসের দুটি ভিন্ন সেশনে কথা বলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা ও গায়ক অঞ্জন দত্ত এবং চীনের সাংহাই ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি চেয়ার শি চুয়ান।

উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হয় ইরানি পরিচালক মুর্তজা আতাশ জমজম নির্মিত ঢাকার অভিনেত্রী জয়া আহসান অভিনীত *ফেরেশতে*, এরপর প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় শ্যাম বেনেগাল নির্মিত *মুজিব: একটি জাতির রূপকার*।

উৎসবের উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ও বলিউড অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন ঘর পেলেন প্রতিবন্ধী তিন ভাইবোন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সিংগী গ্রামের একই পরিবারের তিন ভাইবোন প্রতিবন্ধী। বড়ো ভাই লিপন দাসের (৩৮) এক পায়ে সমস্যা, দুই যুগের বেশি সময় বিছানায় পড়ে থাকা লিপি দাস (২৭), শিমুল দাস (২৩) নিজের পরিবারের জন্য ভ্যানগাড়ি চালিয়ে কোনোরকম দিনযাপন করে আসছিল। প্রতিবন্ধী এই পরিবারের থাকার জন্য কোনো ঘর ছিল না। তাদের দুরবস্থার সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে এলে তার তত্ত্বাবধানে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বেসরকারি সংস্থা এবং গ্রামের অনেকের সহযোগিতায় প্রায় ১ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের জন্য একটি নতুন পাকা ঘর নির্মাণ করে ১১ই জানুয়ারি ২০২৪ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নতুন ঘর হস্তান্তর শেষে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান বলেন, আজ তাদের কাছে নতুন ঘরটি হস্তান্তর করতে পেরে আমি আনন্দিত। পরিবারটির প্রতি আমি খেয়াল রাখব।

কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ এস এম জাহাঙ্গির সিদ্দিকি ঠাণ্ডু জানান, এ পরিবারটির আর কোন সহযোগিতা হলে ভালো হয় সে ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখা হবে। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবুপদ বিশ্বাস বলেন, আমরা সুশাসন, মানবাধিকার ও উন্নয়ন নিয়ে সাধারণত কাজ করে থাকি। তাদের দুরবস্থার খবর পত্রপত্রিকায় পড়ে আমি উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করি। বেশ কিছু দানশীল ব্যক্তি ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের বসবাসের জন্য একটি বাড়ি করে দিতে পেরে ভালো লাগছে।

নতুন ঘর পেয়ে লিপন দাস জানান, নতুন এ ঘর পেয়ে আমি অনেক খুশি। এবার আমার ভাইবোনদের নিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাহাঙ্গীর সিদ্দিকি ঠাণ্ডু, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহনাজ পারভিন, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবুপদ বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

ভারতের বিপক্ষে ৪১ রান করা আরিফুল ইসলাম আয়ারল্যান্ড ম্যাচ মিস করেন। ফিরেই সেঞ্চুরি। ২৬শে জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ১০৩ বলে করেন ১০৩ রান। তার ঝলমলে সেঞ্চুরির সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ যুব দল ২৯১ রান করে। ২৯২ তাড়া করতে নামা যুক্তরাষ্ট্র ৪৭.১ ওভারে ১৭০ রানে অলআউট হয়ে যায়। ১২১ রানের বিশাল জয়ে বাংলাদেশ নিশ্চিত করল অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্স। এর আগে ২২শে জানুয়ারি ব্লুমফন্টেইনে দ্বিতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ছয় উইকেটে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা আয়ারল্যান্ড আট উইকেটে ২৩৫ রান। জবাবে ১৯ বল বাকি থাকতেই জয়ের ঠিকানায় পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

পাকিস্তানকে হারালো বাংলাদেশ

শ্রীলংকার পর পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের বিপক্ষেও জয় পেল স্বাগতিক বাংলাদেশ। ২৭শে জানুয়ারি কক্সবাজারে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজে প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মেয়েরা ১৩৬ রান করেন। জবাবে সাত উইকেটে ১০০ রান তোলেন পাকিস্তানের মেয়েরা। ফলে ৩৬ রানের বড়ো জয় পান স্বাগতিক বাংলাদেশ।

আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে বাংলাদেশের নাহিদা

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক নাহিদা আক্তার নভেম্বর মাসে আইসিসির মাস সেরা খেলোয়াড় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এবার তিনি আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলেও জায়গা পেলেন। ২৩শে জানুয়ারি শ্রীলংকার চামারি আতাপাত্তুকে অধিনায়ক করে ১১ জনের দল ঘোষণা করেছে আইসিসি।

২০২৩ সালে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ উইকেট শিকার করেন নাহিদা। গত নভেম্বরে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ জয়ে বড়ো অবদান ছিল নাহিদার। ৭ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা হন তিনি। সেই পারফরম্যান্স দিয়েই নভেম্বরে বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে আইসিসির মাস সেরা পুরস্কার জেতেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সুপার ওভারে ৫ বলে ৭ রান দিয়ে ২ উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে জেতান নাহিদা। ঐ জয়ে সিরিজে সমতা পায় বাংলাদেশ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি, বাংলাদেশ সিরিজ জিতে নেয় ২-১ ব্যবধানে। ১৫ গড়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন নাহিদা। এবার পাঁচ ক্যাটাগরির বর্ষসেরা দল ঘোষণা করে আইসিসি। ছেলে ও মেয়েদের বর্ষসেরা ওয়ানডে দল, ছেলে ও মেয়েদের বর্ষসেরা টি-২০ দল এবং ছেলেদের বর্ষসেরা টেস্ট দল। ২৪ ও ২৫শে জানুয়ারি মোট ১৩টি ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরা ব্যক্তিগত পুরস্কার দেওয়া হয়।

বর্ষসেরা উদীয়মান নারী ক্রিকেটারের তালিকায় মারুফা

বিভিন্ন বিভাগে ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করে আইসিসি। ৩রা জানুয়ারি প্রথমদিনে প্রকাশিত হয় সেরা উদীয়মান ও সেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়াদের নাম। বর্ষসেরা উদীয়মান নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার জয়ের দৌড়ে মনোনয়ন পেয়েছেন বাংলাদেশের ১৯ বছর বয়সি পেসার মারুফা আক্তার। চারজনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মারুফার সঙ্গে আছেন ইংল্যান্ডের লরেন বেল, অস্ট্রেলিয়ার ফিবি লিচফিল্ড ও স্কটল্যান্ডের ডার্সি কার্টার। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর বাংলাদেশ নারী দলের বড়ো ভরসা হয়ে ওঠেন মারুফা। গত বছর ওয়ানডেতে ২৪.৭৭ গড়ে নয় উইকেট ও টি-২০-তে ২৩.৩০ গড়ে ১০ উইকেট নেন তিনি।

লাল-হলুদ জার্সিতে ইতিহাস সানজিদার

ভারতের কলকাতার শতবর্ষী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ১০ নম্বর জার্সিতে অভিষেক হলো সানজিদা আক্তারের। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের এই উইঙ্গার লাল-হলুদ জার্সিতে ভারতের নারী ফুটবল লিগে অভিষেকে ইতিহাস গড়েছেন। মোনেম মুন্নার স্মৃতিবিজড়িত কলকাতা ইস্টবেঙ্গল নারী ফুটবল দলে এ মৌসুমে সানজিদাই প্রথম বিদেশি খেলোয়াড়। ৩০শে জানুয়ারি ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল আতিথ্য দেয় স্পোর্টস ওডিশাকে। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে আলো ছড়িয়েছেন সানজিদা। ২২ বছরের এই তরুণীকে একাদশে রাখেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

না ফেরার দেশে জনপ্রিয় অভিনেতা আহমেদ রুবেল

কাজী মারুফা

মঞ্চ-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা আহমেদ রুবেল চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তাঁর অভিনীত 'পেয়ারার সুবাস' চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীতে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের স্টার সিনেপ্লেক্সে যোগ দিতে গিয়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অভিনেতা আহমেদ রুবেল ১৯৬৮ সালের ৩রা মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের রাজারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ছোটোবেলা থেকে তাঁর বেড়ে ওঠা গাজীপুর ও ঢাকা শহরকেন্দ্রিক। পরিবারসহ তিনি থাকতেন গাজীপুরের উত্তর ছায়াবীথি এলাকায়। তাঁর বাবা অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

আহমেদ রুবেলের অভিনয়ের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে মঞ্চনাটক দিয়ে। প্রয়াত নাট্যকার সেলিম আল দীনের নাট্যদল ঢাকা থিয়েটার-এ 'হাতহদাই' মঞ্চনাটকের মধ্যে দিয়ে অভিনয় যাত্রা শুরু। তাঁর প্রথম টেলিভিশন নাটক 'স্বপ্নযাত্রা'। এরপর তিনি হুমায়ূন আহমেদের ঈদনাটক 'পোকা'য় অভিনয় করেন। এছাড়া হুমায়ূন আহমেদের 'অতিথি', 'নীল তোয়ালে', 'বিশেষ ঘোষণা', 'সবাই গেছে বনে', 'বৃক্ষমানব', 'যমুনার জল দেখতে কালো' নাটকে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। এক পর্বের এবং ধারাবাহিক নাটকের মধ্যে 'প্রেত', 'প্রতিদান', 'এফএনএফ', 'একান্নবর্তী', 'রঙের মানুষ', 'পাথর', 'অতল', 'চেয়ার', 'স্বর্ণকলস', 'আয়েশার ইতিকথা', 'সৈয়দ বাড়ির বউ'সহ আরও অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন আহমেদ রুবেল।

১৯৯৪ সালে বাণিজ্যিক ধারার 'আখেরি হামলা' সিনেমা দিয়ে চলচ্চিত্রে আহমেদ রুবেলের যাত্রা শুরু হয়। এরপর 'আজকের ফায়সালা', 'মুক্তির সংগ্রাম', 'রঙিন রংবাজ', 'কে অপরাধী', 'সাবাস বাঙালী', 'মেঘলা আকাশ', 'পৌষ মাসের পিরীত'সহ আরও সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। তবে চলচ্চিত্রে আহমেদ রুবেলকে জনপ্রিয়তা ও পুরস্কার এনে দেয় হুমায়ূনের 'চন্দ্রকথা', 'শ্যামল ছায়া' চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে। এছাড়া 'ব্যাচেলর', 'দ্য লাস্ট ঠাকুর', 'অলাতচক্র', 'লাল মোরগের ঝুঁটি', 'প্রিয় সত্যজিৎ', 'দেশান্তর', 'গেরিলা', 'চিরঞ্জীব মুজিব' প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলোতে তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন। নুরুল আলম আতিক পরিচালিত 'পেয়ারার সুবাস' চলচ্চিত্রটি তাঁর সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ছিল।

কলকাতার সিনেমাতেও আহমেদ রুবেল কাজ করেছেন। ২০১৪ সালে ভারতের নির্মাতা সঞ্জয় নাগ পরিচালিত 'পারাপার'-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। বর্তমানে হালের ওটিটিতেও রুবেল সরব হয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী গোয়েন্দা চরিত্র 'ফেলুদা' হিসেবেও তাকে পাওয়া গেছে। 'নয়ন রহস্য' উপন্যাস অবলম্বনে তৌকির আহমেদ পরিচালিত ওয়েব সিনেমায় 'ফেলুদা' হয়েছিলেন রুবেল। এছাড়া 'কাইজার' সিরিজেও তাঁকে দেখা যায়।

অভিনেতা আহমেদ রুবেলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোক বার্তায় তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কবরস্থানে মরহুম আহমেদ রুবেলকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 08, February 2024, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd